দাম : সাত টাকা

স্বস্তিকা

৬৪ বর্ষ, ৩৪ সংখ্যা।। ২৩ এপ্রিল - ২০১২।। ১০ বৈশাখ - ১৪১৯

শিশুমৃত্যু স্বাভাবিক, মনে করেন মুখ্যমন্ত্রী

বি সি রায়ে ফের মৃত্যু পাঁচ শিশুর, অবরোধ

● প্রথম পৃষ্ঠার পর

এদিন এক মৃত শিশুর অভিভাব
জানিয়েছেন, সিস্টার বলেছিল ছে
ভালো আছে। এখুনি চিকিৎস
দরকার নেই। আরও খানিকক্ষণ বিনি
আবেদন করায় অভিভাবকদের ওপ
চেঁচামেচি করে হেনস্তা করা হয়েছি
বলে অভিযোগ এনেছেন শিশুদে
আত্মীয়রা। অথচ ৫মাসের ছেলে
ক্রমশই মৃত্যুর দিকে চলে যাচে
চিকিৎসককে খবর দেওয়া হলেও

মালদহে ফের মৃত্যু ৭ শিশুর, জালসিতে আত্মঘাতী এক চাষি

৩৬ ঘণ্টায় ১১ জন থামছে না শিশুমৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মালদহ ও কলকাতা: ফের পর পর শিশুমৃত্যু মালদহ সদর হাসপাতালে। হাসপাতাল সূত্রের খবর, সোমবার মাঝরাত থেকে বুধবার দুপুর পর্যন্ত, ৩৬ ঘণ্টায় ১১টি শিশুর মৃত্যু হয়েছে। স্বাস্থ্য গিয়েছে, চলতি মাসে মালদহ হাস জন শিশুর মৃত্যু হল।

মালদহে ৩৬ ঘণ্টায় মৃত ৯ শিশু, ক্ষোভ

সূচিপত্র

সম্পাদকীয় □ ৫

সংবাদ প্রতিবেদন □ ৬-৮

চীনের নিন্দা করে 'সর্বহারার একনায়কত্ব'কে পরিত্যাগ সি পি এমের □ ৯

বাম রাজত্বের রঙ্গকথা আর মা-মাটি-মানুষের রাজত্বের রঙ্গচিত্রের মিল পাচ্ছেন? □ ১০

মমতার রকম-সকম □ তথাগত রায় □ ১২

পরিকাঠামোর পরিবর্তন না হলে বেহিসেবী শিশুমৃত্যুর কোনও কৈফিয়ত নেই □ সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় □ ১৪

শিশুদের চিকিৎসায় অবহেলা দিনে দিনে বাড়ছে □ রমাপ্রসাদ দত্ত □ ১৬

খোলা চিঠি : ইমাম চিনি 'ইনাম' দেইখ্যা, বামুন চিনি কেমনে! □ সুন্দর মৌলিক □ ১৮

পৌরাণিক নগর মদ্র □ গোপাল চক্রবর্তী □ ২১

ঘাঘর বুড়ি □ নবকুমার ভট্টাচার্য □ ২২

অজি শুভদিনে পিতার ভবনে □ অর্ণব নাগ □ ২৩

ব্যক্তিগত নয়, চাই পারিবারিক ক্ষমতায়ন □ মিতা রায় □ ২৬

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভোট : ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে □ জি পার্থসারথি □ ২৮

ঝড়-বৃষ্টিতে আমচাষে ব্যাপক ক্ষতি মালদায় □ ৩০

সমাজের বিবিধক্ষেত্রে স্বয়ংসেবকরা নীরবে কাজ করে চলেছে □ রোহিনীপ্রসাদ প্রামাণিক □ ৩১

জাতীয় মূকাভিনয় উৎসব □ দেবাদিত্য চক্রবর্তী □ ৩৯

নিয়মিত বিভাগ

প্রাসঙ্গিকী : ১১ □ □ চিঠিপত্র : ১৯ □ □ জনমত : ২০ □ □ নবাঙ্কুর : ২৪-২৫ □ বাংলাদেশের আয়নায় : ২৭ □ □ সমাবেশ-সমাচার : ৩৬-৩৭ □ □ অন্যরকম : ৩৮ □ □ শব্দরূপ : ৪০ □ □ চিত্রকথা : ৪১

সম্পাদক : বিজয় আঢ্য

সহ সম্পাদক : বাসুদেব পাল ও নবকুমার ভট্টাচার্য

প্রচ্ছদ ও রূপায়ণ : অজিত কুমার ভকত

৬৪ বর্ষ ৩৪ সংখ্যা, ১০ বৈশাখ, ১৪১৯ বঙ্গাব্দ

যুগাব্দ - ৫১১৪, ২৩ এপ্রিল - ২০১২

দাম : ৭ টাকা

প্রচ্ছদ নিবন্ধ

বেহিসেবী শিশুমৃত্যু — ১৪-১৬

স্বস্তিক প্রকাশন ট্রাস্টের পক্ষে রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক ২৭/১-বি, বিধান সরণি, কলকাতা - ৬ হতে প্রকাশিত এবং সেবা মুদ্রণ, ৪৩, কৈলাস বোস স্ট্রীট, কলকাতা- ৬ হতে মুদ্রিত।

দূরভাষ : সম্পাদকীয় : ৯৮৭৪০৮০৩৪৩

অফিস : ৯৮৭৪০৮০৩৫৪, ৯৮৭৪০৮০৩৪১

বিজ্ঞাপন : ৯৮৭৪০৮০৩৪২

Postal Registration No.- Kol.RMS/048/2010-2012

R N I No. 5257/57

দূরভাষ : ২২৪১-০৬০৩ / ৫৯১৫

টেলিফ্যাক্স : (০৩৩) ২২৪১-৫৯১৫

E-mail : swastika5915@gmail.com

vijoy.adya@gmail.com

Website : www.eswastika.com

স্বস্তিকা

আগামী সংখ্যার আকর্ষণ

বিশেষ বিষয় : কয়লা কেলেঙ্কারী

দুর্নীতিগ্রস্ত দ্বিতীয় ইউ পি এ সরকারের কেলেঙ্কারীর লম্বা তালিকায় নবতম সংযোজন কয়লা কেলেঙ্কারী। এবং বলাই বাহুল্য, এহেন কেলেঙ্কারীতে আর্থিক অনিয়মের পরিমাণ এতাবৎকালের মধ্যে সবচেয়ে বেশি— ১০ লক্ষ ৬৭ হাজার কোটি টাকা। এনিয়ে ক্যাগ রিপোর্ট ফাঁস হতেই তাকে ‘খসড়া’ বলে চালিয়ে মূল রিপোর্টে এই বিরাট ও মারাত্মক কেলেঙ্কারী গোপন করার চক্রান্ত শুরু হয়েছে কেন্দ্রের তরফে। বিশ্লেষণে **বাসুদেব পাল** এবং **এন সি দে**।

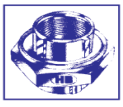

অন্যান্য আকর্ষণীয় বিষয়ও থাকছে।

সম্পাদকীয়

ইমাম ভাতা

বিভাজনের বিষাক্ত বীজ রোপনের চেষ্টা চলিতেছে। রাজ্যটা নাকি ধর্মনিরপেক্ষতার স্বর্গরাজ্য। এখন সেই ধর্মনিরপেক্ষতার স্বর্গরাজ্যেই মহামান্য ইমামদের ভাতা দিবার প্রচেষ্টা শুরু হইয়াছে। কারণ ইমামতি করিয়া পেটভরণ হয় না। তাই সরকার কিছু মাসিক সহায়তা দিবার চেষ্টা করিতেছে। ইমামদের সন্তানদের জন্য ফ্রি-তে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা থাকিবে এবং ইমামদের থাকিবার জন্য সস্তায় জমি ও বাড়ি তৈরির জন্য সাহায্য মিলিবে। মজার কথা হইল ইমামসহ মুসলমানদের আর্থিক সামাজিক জীবন বৈচিত্র্য সমীক্ষণ করিবার জন্য ইতিপূর্বে তিনটি কমিটি গঠিত হইয়াছে। সেই কমিটিগুলির একটির কাজ ছিল মুসলমানদের জীবনযাত্রার Diversity Index তৈয়ারি করা, কিন্তু আজও সেই কাজ আরম্ভ হয় নাই। ইমামদের ভাতা, উর্দুকে দ্বিতীয় সরকারি ভাষা ঘোষণার মধ্যেই নিহিত রহিয়াছে পৃথক মুসলিম রাষ্ট্রের বীজ। এই দাবিগুলি ১৯৩৮ সালে মুসলিম লিগের পীরপুর সম্মেলনে ছিল। আজ রাজ্যে পরিবর্তনের পর মুসলিমদের এই দুইটি দাবি পূর্ণ হইবার পথ প্রশস্ত হইয়াছে। রাজ্যের সরকার তিরিশ হাজার ইমামকে মাসিক আড়াই হাজার টাকা করিয়া ভাতা দেওয়ার সিদ্ধান্ত লইয়াছেন। এখন প্রশ্ন, এই তিরিশ হাজার ইমামকে বাছাই করিবার যোগ্যতাবলী কি? তাছাড়া ইমামপদটি চিরস্থায়ী নয়। ইমাম পদটি পরিবর্তনশীল। তাহা হইলে আজ যে ইমাম ভাতা, জমি কিংবা বাড়ি পাইলেন, ছেলে মেয়েদের শিক্ষার জন্য অর্থ পাইলেন কাল তাঁহার জায়গায় নতুন ইমাম নিযুক্ত হইলে পুরোনো ইমামের ভাতা, বাড়ী, ছেলেমেয়েদের শিক্ষা ভাতার কি হইবে?

মুসলিম ভোট পাইতে এই সরকার যে সমস্ত কাণ্ড করিতেছে তাহা কেবলমাত্র মুসলিম লীগের নেতা-নেত্রীকেই মানায়। সেকুলার নামাবলি গায়ে চড়াইয়া মুসলিম তোষণ এই দেশে সমান তালে চলিতেছে। কংগ্রেস এই কাণ্ড করিতেছে, সিপিএম করিতেছে, আজ তৃণমূল শুরু করিতেছে। তাহা হইলে অকারণে কেবলমাত্র নরেন্দ্র মোদীকে সাম্প্রদায়িক বলিয়া গালাগালি দিবার এই ভণ্ডামি কেন? রাজ্যে মালদহ ও মুর্শিদাবাদ জেলায় মুসলিমরা সংখ্যাগুরু। এছাড়া বর্ধমান, উত্তরদিনাজপুর, উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা, হাওড়া, হুগলি এবং পূর্ব মেদিনীপুরে মুসলিম ভোটের উপরে নির্ভর করিয়া বহু এলাকায় পঞ্চায়েত জয়পরাজয় নির্ধারিত হইবে— একমাত্র সেই লোভেই নাকি তৃণমূলের এই তালিবানী বন্দনা। সিপিএমের পথ অনুসরণ করিয়া এই সরকারও চায় মুসলমানরা সমাজে মানুষ হিসেবে পরিচিত না হইয়া ভোটব্যাঙ্ক হিসেবেই থাকুক। সেজন্যই মুখ্যমন্ত্রীর দশ হাজার মাদ্রাসাকে আইনী স্বীকৃতির উদ্যোগে। মুসলিমরা থাকুক গোঁড়ামির আবর্তে। তাই সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলে মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিক কলেজ খোলার খবর পাওয়া যায়নি।

ইমামদের ভাতা দেওয়ার ঘোষণা এবং উর্দুকে দ্বিতীয় সরকারী ভাষার তকমা— পশ্চিমবঙ্গে এক ভয়ানক রাজনীতির সূচনা করিলেন মমতা। মমতার এই ঘোষণায় ইসলামী জঙ্গীরা এবং আই এস আই উৎসাহ বোধ করিবে। আগামীদিনে মমতার হাত ধরিয়া পশ্চিমবঙ্গের ইসলামীকরণ হইলে অবাক হইবার কিছু থাকিবে না।

জাতীয় জাগরণের মন্ত্র

এ সনাতন ধর্মের দেশ। এদেশ পড়ে গেছে বটে, কিন্তু নিশ্চয় আবার উঠবে। এমন উঠবে যে, জগৎ দেখে অবাক হয়ে যাবে। দেখিসনি নদী বা সমুদ্রে তরঙ্গ যত নামে, তারপর সেটা তত জোরে ওঠে? এখানেও সেইরূপ হবে। দেখছিসনি— পূর্বাকাশে অরুণোদয় হয়েছে, সূর্য ওঠার আর বিলম্ব নেই? তোরা এই সময়ে কোমর বেঁধে লেগে যা— সংসার-ফংসার ক'রে কি হবে? তোদের এখন কাজ হচ্ছে দেশে দেশে গাঁয়ে-গাঁয়ে গিয়ে দেশের লোকদের বুঝিয়ে দেওয়া যে, আর অলিস্যি ক'রে বসে থাকলে চলছে না। শিক্ষাহীন ধর্মহীন বর্তমান অবনতিটার কথা তাদের বুঝিয়ে দিয়ে বলগে, 'ভাইসব, ওঠ, জাগো। কতদিন আর ঘুমুবে?' আর শাস্ত্রের মহান সত্যগুলি সরল ক'রে তাদের বুঝিয়ে দিগে। এতদিন এদেশের ব্রাহ্মণরা ধর্মটা একচেটে ক'রে বসেছিল। কালের স্রোতে তা যখন আর টিকলো না, তখন সেই ধর্মটা দেশের সকল লোকে যাতে পায়, তার ব্যবস্থা করগে। সকলকে বোঝাগে ব্রাহ্মণদের মতো তোমাদেরও ধর্মে সমান অধিকার। আচণ্ডালকে এই অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত কর। আর সোজা কথায় তাদের ব্যবসা-বাণিজ্য কৃষি প্রভৃতি গৃহস্থজীবনের অত্যাবশ্যক বিষয়গুলি উপদেশ দিগে। নতুবা তোদের লেখাপড়াকেও ধিক্, আর তোদের বেদবেদান্ত পড়াকেও ধিক্।

— স্বামী বিবেকানন্দ

বর্ণময় অনুষ্ঠানে স্বস্তিকা'র নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ বক্তব্য শুরু হয়েছিল ৬৪ বছরের নিরন্তর পথ চলা দিয়ে। বলছিলেন, ''এটা খুব সহজ কাজ নয়। অনেক বড় বড় পত্রিকা বেরিয়েছে আবার বন্ধও হয়ে গিয়েছে। যেমন হিন্দুস্থান, মারাঠা, লিডার, সনাতন ধর্ম, ন্যাশনাল হেরল্ড, ইলাসট্রেটেড উইকলি, অমৃতবাজার পত্রিকা, যুগান্তর। এদের আদর্শ, উদ্দেশ্যের খামতি ছিল না। তবু লোকসানের ভার সামলাতে না পেরে, কর্মচারীদের বেতন দিতে না পারার জন্য উঠে যেতে বাধ্য হয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম স্বস্তিকা। ৬৪ বছর পেরিয়ে এসেও সমাজের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আওয়াজ তোলার 'হিম্মত' রেখেছে স্বস্তিকা''। প্রায় মিনিট পঁচিশেক বক্তব্যের শেষপ্রান্তে পৌঁছে বর্তমান সংবাদমাধ্যমগুলোর রমরমার পেছনে পেট্রো- ডলারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার কথা উপস্থিত শ্রোতৃবর্গকে স্মরণ করিয়ে দিলেন। স্পষ্ট বললেন, 'ব্যতিক্রমী স্বস্তিকার ভরসা কিন্তু পাঠকরাই'। আর সেইসূত্রে আহ্বান করলেন, ''১০০ বছর চলুক স্বস্তিকা। বাড়তেই থাকুক পাঠক সংখ্যা। ৫ টাকা থেকে ৭ টাকা কাগজের দাম বাড়াতে হয়েছে। অসম, ত্রিপুরা থেকেও স্বস্তিকা'র সংস্করণ বেরোক।''

বক্তব্য রাখছেন ডঃ কৃষ্ণগোপাল শর্মা। — ছবি : শিবু ঘোষ

গত ১৩ এপ্রিল প্রাক্-নববর্ষের সন্ধ্যায় কলকাতার কেশবভবনে স্বস্তিকা'র নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচনে এসে এমনই অনবদ্য কিছু মুহূর্ত যিনি উপহার দিলেন তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবকসঙ্ঘের সদ্য নিযুক্ত সহ- সরকার্যবাহ ডঃ কৃষ্ণগোপাল শর্মা। স্বস্তিকা'র এবারের নববর্ষ সংখ্যার বিষয় ছিল সমাজ জীবনে সঙ্ঘ। অনুষ্ঠানের বিশেষ অতিথি বিশিষ্ট সাংবাদিক তরুণ গোস্বামী এই প্রসঙ্গে সমাজজীবনের মূল ব্যাধি হিসেবে দেশকে, নিজের মাতৃভূমি তথা দেশের ঐতিহ্য পরম্পরার প্রতি আমাদের অবহেলাকেই চিহ্নিত করলেন। ক্ষোভের সঙ্গে মন্তব্য করলেন, ''আমরা দেশকে ভালবাসি না। ৫ মিনিট নিজের মাতৃভাষায় বলার ক্ষমতা হারিয়েছি। বিদেশী চিন্তা, আদব-কায়দায় অভ্যস্ত হয়ে পড়েছি। আসলে আমরা বোধহয় দেশের মানুষকে ঘৃণাই করি।'' স্বামীজী'র উদ্ধৃতি দিলেন, 'আমি তাদের বিশ্বাসঘাতক বলে মনে করি। যারা সাধারণ মানুষের টাকায় পড়াশুনো শিখে তাদের দিকে ফিরে তাকায় না।' স্বামী বিবেকানন্দ- রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে স্মরণে রেখে জাতীয়তাবোধ আজকের যুবসমাজের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার আহ্বানও জানালেন তরুণ গোস্বামী।

স্বস্তিকা নববর্ষ সংখ্যার আবরণ উন্মোচনের মুহূর্তে তরুণ গোস্বামী, অচিন্ত্য বিশ্বাস, কৃষ্ণগোপাল শর্মা, রণেন্দ্রলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিজয় আঢ্য (বাঁ দিক থেকে)।

অনুষ্ঠানের একটা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব ছিল সভাপতি-র ভূমিকা পালন করা। আর এই দায়িত্বের কথা স্মরণে রেখে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের বিভাগীয় প্রধান তথা বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ডঃ অচিন্ত্য বিশ্বাস জানালেন, মূল্যবোধের শিক্ষার অভাব তাঁর চোখে ধরা পড়েছে। স্পষ্ট বললেন, বাইরে থেকে আসা আদর্শ (পড়ুন মার্কসবাদ) কখনও দেশের চালিকাশক্তি হয়ে উঠতে পারেনি। ইউরোপের জাতি-রাষ্ট্র ভিত্তিক জাতীয়তা নয়, ভারতের ঐতিহ্য-পরম্পরা ভিত্তিক জাতীয়তার আদর্শেই

ভারতকে এগিয়ে যেতে হবে। মূল্যবোধের অভাবই যে দেশকে বিপথে চালিত করছে অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা ডঃ কৃষ্ণগোপাল শর্মা তাঁর বক্তব্যে তা উল্লেখ করেছিলেন, ''আমাদের দেশের মূল্যবোধ আমাদের বেইমানি করতে ভয় পাওয়ায়। মিথ্যে বলতে ভয় পাওয়ায়। আজ মূল্যবোধের সংস্কৃতিকে বিপন্ন করে দেশের মেরুদণ্ডকে ভেঙে দেবার প্রচেষ্টা চলছে। আমাদের দেশের মূল্যবোধ রয়েছে রামায়ণ, মহাভারত, গীতায়। তবে আজ 'বেইমানী'র শিক্ষা কেন?'' এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করলেন প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের কথা, যিনি ছিলেন 'অনেক উচ্চস্তরের বিজ্ঞানী'। অথচ যার জীবনযাত্রা ছিল সহজ সরল অনাড়ম্বর। তাঁর জন্ম 'এই বাংলা'তেই, যিনি নিয়েছিলেন 'গরীব বিদ্যার্থীদের পড়াশুনোর ভার'। যা ছিল 'ভারতীয় মূল্যবোধেরই প্রতিফলন'।

সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে উদ্ধৃত করে তিনি জানালেন, যে লোকেরা দেশটাকে টুকরো করল তাদের সংখ্যালঘু বলা মানে মূর্খামী। তিনি বললেন, ''সুপ্রিম কোর্ট এই বিষয়টাকে বার তিনেক খারিজ করার পর নানা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়ে সরকার ওবিসি ইত্যাদির মাধ্যমে মুসলমানদের সংরক্ষণের সুযোগ দিতে চলেছে।''প্রশ্ন তুললেন, এনিয়ে হঠাৎ সংবিধান সংশোধন কেন? এই পথেরই শরিক হয়ে অচিন্ত্য বিশ্বাস বললেন, কৃষ্ণগোপাল- বাবুর বক্তব্য আপাতদৃষ্টিতে রাজনৈতিক মনে হতে পারে, কিন্তু যারা ভারতবর্ষকে টুকরো টুকরো করেছেন, আর আমরা যদি সেটা দেখতে পাই তবে প্রশ্নটা আর রাজনৈতিক থাকে না। অনুষ্ঠানে স্বস্তিকা'র নববর্ষ সংখ্যার আনুষ্ঠানিক উন্মোচন করলেন ডঃ কৃষ্ণগোপাল শর্মা। তাঁর হাতে নববর্ষ সংখ্যা তুলে দিলেন স্বস্তিকার সম্পাদক বিজয় আঢ্য। প্রদীপ প্রজ্জ্বলন করে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেছিলেন ডঃ শর্মা। অনুষ্ঠানে বাড়তি মাত্রা যোগ করে সংস্কার ভারতীর সঙ্গীতানুষ্ঠান। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন স্বস্তিকা পত্রিকার সহ-সম্পাদক নবকুমার ভট্টাচার্য। ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন ব্যবস্থাপক অভিজিৎ রায়চৌধুরী। অনুষ্ঠানের সভাপতি অচিন্ত্য বিশ্বাসের স্বস্তিকা পরিবারের প্রতি উদাত্ত আহ্বান, 'আপনাদের যাত্রা শুভ হোক। স্বস্তিকা দৈনিক হোক।' প্রেরণা হয়ে রইলো আগামীদিনের।

ভুয়ো সংঘর্ষ নিয়ে শুধু গুজরাটকেই টার্গেট করা কেন?

নিজস্ব প্রতিনিধি॥ সারাদেশে বহু রাজ্যেই সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ থেকে নিরীহ নাগরিকদের সুরক্ষা দিতে পুলিশ প্রশাসনকে অনেক ক্ষেত্রেই ভুয়ো সংঘর্ষের পথ নিতে হচ্ছে। কিন্তু আশ্চর্যের কথা অন্যান্য রাজ্যের বেলায় চোখ ফিরিয়ে রাখলেও বারবার কেবলমাত্র গুজরাটকেই টার্গেট করা হচ্ছে কেন? এই মর্মে সুপ্রীম কোর্টে এক অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ পিটিশন দাখিল করল গুজরাট সরকার। সংবাদে প্রকাশ, সুপ্রীম কোর্ট 'জাস্টিস শা কমিটিকে' ২০০২ থেকে ২০০৬ সালের মধ্যে গুজরাটে ২২টি পুলিশি সংঘর্ষে মৃত্যুর ঘটনার পৃথক পৃথক তদন্ত করার নির্দেশ দিয়েছে। এই আদেশের পরিপ্রেক্ষিতেই দাখিল করা পিটিশনে গুজরাট সরকার জানিয়েছে যে তারা নাগরিকদের নিরাপত্তা সম্বন্ধে সদা সতর্ক। সাধারণ পুলিশ কর্মীদের সার্ভিস রিভলবার যে জঙ্গীদের এ কে ৫৬-এর মতো অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্রের কাছে তুচ্ছ একথাও দরখাস্তে বলা হয়েছে।

গুজরাট সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই পিটিশনটিতে আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলা হয়েছে, ভুয়ো সংঘর্ষ বন্ধ করার ব্যাপারে রাজ্য সরকার সহমত হলেও অনেক সময়ই দাগী আতঙ্কবাদীদের ক্ষেত্রে বহু সৎ পুলিশ অফিসারই কিছু কায়েমী স্বার্থান্বেষীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভুয়ো সংঘর্ষের অজুহাতটির ভয়ে কর্তব্য সম্পাদনে দ্বিধাগ্রস্ত হয়ে পড়তে পারেন। পিটিশনটির বয়ান অনুযায়ী গুজরাট সরকার মুম্বাই-এ গত ৩ বছরে ৩০০টি পুলিশি সংঘর্ষের উল্লেখ করেছে। সরকারী হিসেব মতো মুম্বাই পুলিশের বিশেষ বাহিনী **(Special Squard)** গড়ে বছরে ১০০ করে অপরাধ জগতের দাগীকে নির্দেশ করেছে। সংবাদ অনুযায়ী— এ ক্ষেত্রে তারা ইজরায়েলের অনুসৃত 'চোখের বদলে চোখ' বা 'দাঁত-এর বদলে দাঁত' এর নীতিই অনুসরণ করেছে। উল্লেখের বিষয় সংশ্লিষ্ট পুলিশ আধিকারিকরা মহানায়কের মর্যাদা পেয়েছেন। এঁদের অনুকরণে অনেক ব্যয়বহুল চলচিত্র তৈরী হয়েছে। দরখাস্তটিতে আশির দশকের সন্ত্রাসে অশান্ত পাঞ্জাব ও '৭০ দশকের উত্তাল হত্যালীলায় মত্ত পশ্চিমবঙ্গের ঘটনাবলীর জের টেনে বলা হয়েছে সেই সময়ের পাঞ্জাব পুলিশকর্তা গিল এমন অনেকক্ষেত্রেই পুলিশের উপদেষ্টা হিসেবে আদর্শ। পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রেও 'প্রতিবাদী রাষ্ট্রীয় সন্ত্রাসের' তত্ত্ব স্বীকৃতি পেয়েছে।

আলোচ্য দরখাস্তটি এ প্রসঙ্গে কাউকেই ছেড়ে কথা বলেনি। ইতিপূর্বে হিন্দি ফিল্মের গান লেখক জাভেদ আখতার ও দিল্লী প্রবাসী সাংবাদিক বি জি ভারগিসের গুজরাট সরকারের বিরুদ্ধে আনা দুটি আলাদা পিটিশনকেও আওতার মধ্যে এনেছে। সরকারের দাখিলকৃত আবেদনে বলা হয়েছে, ওই দুই ব্যক্তিই জীবনে কখনও সমাজসেবামূলক কাজে অংশ নেননি। এছাড়া তাদের দু' জনের কেউই গুজরাটের বাসিন্দা তো ননই, তাঁরা কখনও এরাজ্যে আসেনওনি। শ্রী আখতারের করা রিটপিটিশনটির উল্লেখ করে গুজরাট সরকারের বক্তব্য, তিনি মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা যেখানে কয়েক বছরের মধ্যে লক্ষণীয়ভাবে কয়েকশ মানুষ পুলিশী সংঘর্ষে খুন হয়ে গেলেও তিনি টুঁ শব্দ করেননি। অথচ গুজরাটে তাঁর পছন্দমতো কিছু সময়সীমায় ঘটা সংঘর্ষের বিষয়ে তিনি মহামান্য আদালতের কাছে তদন্ত দাবী করেছেন। সরকারী পিটিশন অনুযায়ী শ্রী ভার্গিস দিল্লীর বাসিন্দা ও গুজরাটে পা রাখেননি। তিনিও সব রাজ্যবাসীর মানবাধিকার বিস্মৃত হয়ে কেবলমাত্র গুজরাটেই নির্দিষ্ট কয়েক বছরের সংঘর্ষের মৃত্যুর তদন্তের আর্জি জানিয়েছেন। উল্লেখিত পিটিশনে এই সম্পূর্ণ পরিস্থিতি ও উদ্দেশ্য বিচার করে কেবলমাত্র মানবাধিকার রক্ষার তথাকথিত বিশেষ ক্ষেত্রে মহান দায়িত্ব জাগ্রত হওয়ার বিষয়টিকে একক বিচার্য না করে, একটি স্বয়ংসম্পূর্ণ নীতি নির্ধারণ ও পদ্ধতি প্রণয়নের আর্জি জানানো হয়েছে।

ইমাম ভাতা সর্বনেশে রাজনীতি, পরিমাণ সামলাতে পারবেন না মমতা

নিজস্ব সংবাদদাতা॥ প্রত্যাশা মতোই মসজিদের ইমামদের জন্য বিশেষ প্যাকেজ ঘোষণা করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। যা দেশের অন্য সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের মুসলমান তোষণের সমস্ত মাত্রাকে অতিক্রম করে গিয়েছে। এভাবে খোলাখুলি মুসলমানদের জন্য রাজকোষের টাকা বিলোনোর ঘটনা ভারতে হয়নি। ইমামদের মাসিক ভাতার প্রদানের ঘটনা রাজ্যজুড়ে সাম্প্রদায়িক পরিস্থিতিকে জটিল করে তুলেছে। একদিকে হিন্দু পুরোহিতরা যেমন মাসিক ভাতা চেয়ে সরব হয়েছেন, তেমনই অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের ধর্মগুরুরাও একজোট হয়ে সরকারের কাছে দাবি জানানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে। যার ফলে অচিরেই পশ্চিমবঙ্গে সরকারের কাছে ধর্মের ভিত্তিতে দাবি দাওয়া আদায়ের প্রবণতা বাড়বে। তা অতীব মারাত্মক আকার নিতে পারে। সরকারের দানসত্রের ভিত্তিতে সমাজটাই ধর্মীয় ভাবে দ্বিধাবিভক্ত হয়ে যেতে পারে।

রাজ্যে সবমিলিয়ে নাকি ৭০ হাজার ইমাম রয়েছে। এমনই দাবি করেছেন মুসলমান সমাজের প্রতিনিধিরা। যার অর্থ এরাজ্যে প্রতি দেড় হাজার জনসংখ্যা পিছু একটি করে মসজিদ রয়েছে। কারণ, প্রথামতো মসজিদপিছু একজন করে ইমাম থাকার কথা। মমতা ঘোষণা করেছেন সবমিলিয়ে ৩০ হাজার ইমামকে মাসিক ভাতা দেওয়া হবে। অর্থাৎ ৭০ হাজারের মধ্যে মাত্র ৩০ হাজার ইমাম ভাতা পাবেন। ফলে ইমামদের মধ্যেও গোলমাল বাধতে বাধ্য। সরকারের বছরে খরচ হবে ৯০ কোটি টাকা। এই টাকা আসবে করদাতাদের পকেট থেকেই। যারা ধর্মীয় দান খয়রাতির জন্য কর দেয়নি। রাজ্যের উন্নয়নের জন্য সরকার যে কর আদায় করেছে সেই টাকা দিয়ে একটি ধর্মীয় সমাজের পকেট ভরে দেওয়া হচ্ছে। শুধুমাত্র ভোটের আশায়।

বিপরীত দিকে প্রশ্ন উঠেছে পুরোহিতরা কী দোষ করলেন? ইসলামের পদ্ধতিগত কাঠামোয় ইমামদের ভরণপোষণের ভার সমাজের। যে গ্রামের মসজিদ, ইমাম ও তার পরিবারের পালন করার ভারও সেই গ্রামের। ইমামের বেতন, পোশাক আশাক ইত্যাদি রয়েছে। এক জন ইমাম মাসে ১০ হাজার টাকা রোজগার করে থাকে। কিন্তু পুরোহিতদের অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয়। হিন্দু ধর্মীয় কাঠামোয় পুরোহিতদের প্রতিপালনের কোনও নির্দিষ্ট নিয়ম নেই। কিছু বৃহৎ মন্দিরের পুরোহিত বিগ্রহ পুজোআচ্চা করে দিন গুজরান করেন। কিন্তু গ্রামে গ্রামে ছড়িয়ে থাকা দুঃস্থ পরিবারের পুরোহিতদের দেখার কেউ নেই। তাঁরা এখন সরকারের কাছে নতুন দাবি নিয়ে প্রতিবাদ জানাচ্ছে। ইমামরা পেলে তাঁদের দাবিও যুক্তিযুক্ত।

সামগ্রিক বিচারে কোনও ধর্মনিরপেক্ষ দেশে এধরনের ঘটনা অত্যন্ত নিন্দনীয়। সরকার আগুন নিয়ে খেলছে। যার পরিণাম ভালো হবে না বলেই মনে করা হচ্ছে। সামনে পঞ্চায়েত ভোট। সেই ভোটে জিততেই মমতা মুসলমানদের জন্য তোফা দিয়েছেন। সেই একই ভোটে হিন্দু সমাজও ভোট দেবে। একই গ্রামের মসজিদের ইমাম মাসে ২৫০০ টাকা ভাতা পাবেন। ছেলেমেয়েদের শিক্ষার টাকা পাবেন, সরকারের দেওয়া জমি পাবেন। আর গ্রামে শিব কিংবা কালীমন্দিরের পূজারী চাল-কলাপ্রত্যাশী হয়েই দিনযাপন করবেন, তা হতে পারে না। তাই গ্রামে গ্রামে ধিকিধিকি আগুনে জ্বলছে। সামনের ভোটে মমতা তা টের পাবেন।

চীনের নিন্দা করে ‘সর্বহারার একনায়কত্ব’-কে পরিত্যাগ সিপিএমের

রাজ্য রাজনীতি

নিশাকর সোম

কেরলের কোঝিকোডে সিপিএমের ২০তম সর্বভারতীয় পার্টি- কংগ্রেস-এ মার্কস লিখিত কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো-এর নিদান--- ‘সর্বহারার একনায়কত্ব’-কে পরিত্যাগ করল সিপিএম। আদর্শগত দলিলে চীনকে নিন্দা করে সমাজতন্ত্রের সমালোচনায় মুখর হয়েছে সিপিএম। দলিলে বার বার বলা হয়েছে দেশের বাস্তব পরিস্থিতি অনুযায়ী সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার কথা ভাবতে হবে। এবার বোধহয় সিপিএম ভারতীয় হতে চাইছে? কারণ একটাই— বিপ্লববাদ নয়, বিবর্তনবাদ— নির্বাচনের মাধ্যমে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের লক্ষ্যে পৌঁছানো স্থির করেছে। এদেশের কমিউনিস্টদের অভিভাবক বৃটিশ কমিউনিস্ট পার্টি। তারা পার্টির নাম দিয়েছে র‍্যাডিক্যাল সোস্যালিস্ট পার্টি। এদেশের কমিউনিস্ট পার্টি অফ ইন্ডিয়া অদূর ভবিষ্যতে বোধহয় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টি হতে পারে। রাশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির বিংশতিতম কংগ্রেসে ক্রুশ্চভ যে নীতি ঘোষণা করেছিলেন, যে নীতিকে সিপিএম সংশোধনবাদী বলেছিল, সেটাই আজ সিপিএম গ্রহণ করল। সিপিএমের পার্টি কংগ্রেসে বস্তুত রাজনৈতিক সাংগঠনিক ক্ষেত্রে এমনকিছু হয়নি, যার ফলে নিচের তলার কর্মীরা উজ্জীবিত হবেন। সিপিএম এখন নির্ভেজাল নির্বাচনী সংগঠনে পরিণত হলো (আগেই হয়েছিল)। এরফলে পার্টির নিচের তলার কর্মীদের একাংশ মাওবাদী নকশালপন্থী হবেন। সাংগঠনিক ক্ষেত্রে দলাদলির সেই ট্র্যাডিশন আজও বহাল আছে। কেন্দ্রীয় কমিটি ও পলিটব্যুরোতে প্রকাশ কারাত-এর আধিপত্য বজায় থেকেছে। যে প্রকাশের নেতৃত্বে পার্টি প্রতিটি রাজ্যের রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে পড়েছে। এরই সঙ্গে সঙ্গে সিপিআই, ফরওয়ার্ড ব্লক ও আর এস পি দলগুলিতেও নেতৃত্বের লড়াইকে ঘুরিয়ে দেওয়ার চেষ্টা হচ্ছে— সিপিএমের ব্যর্থতার প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে। এই দলগুলিতেও একচেটিয়া নেতৃত্ব কায়েমী স্বার্থকে বজায় রাখার চেষ্টা করছে। কারণ দুর্নীতির দুর্গন্ধকে চাপা দেওয়ার প্রচেষ্টা চলছে।

রাজারহাট-গোপালপুর-এ সিপিএমের নেতৃত্বে হিডকোর দুর্নীতি বের হচ্ছে। ফরওয়ার্ড ব্লকের প্রাক্তন মন্ত্রীকেও দুর্নীতি সম্পর্কে পুলিশি জিজ্ঞাসাবাদ করছে। এইভাবে বামফ্রন্ট সরকারের সকল বিভাগে দুর্নীতির পাঁক জমে আছে। মৎস্য দপ্তরটি তা থেকে ছাড় পাবে! কিরণময়বাবু কি বলেন? কিরণময়বাবু যখন যেমন তখন তেমন নীতিতে বিশ্বাসী!

এ-রাজ্যের কংগ্রেসকে ভেঙে দেবার প্রচেষ্টা চলছে। কংগ্রেসের কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব গদী বাঁচানোর জন্য ক্ষমতা-লোভের যূপকাষ্ঠে এ-রাজ্যের কংগ্রেসকে বলির পাঁঠা করা হয়েছে। যতই চেষ্টা হোক, তৃণমূল নেত্রী প্রণব-ঘনিষ্ঠ সুখেন্দু রায়কে রাজ্যসভার নির্বাচিত করে কংগ্রেসকে ভাঙার ‘মাস্টার স্ট্রোক’ দিয়েছেন। তৃণমূল নেত্রী তাঁর স্তাবকগোষ্ঠী তৈরিতে ব্যস্ত। তাই তিনি কয়েকটি সংবাদপত্রকে অনুমোদন দিয়েছেন। এই অনুমোদিত একটি পত্রিকায় পর্নোগ্রাফির বিপুল প্রদর্শনী চলছে। এটাই কি পরিবর্তিত সংস্কৃতির নমুনা? প্রতুল মুখার্জি কি বলেন? তৃণমূলনেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী ইমামদের নিয়ে সম্মেলন করলেন। সেখান থেকেই ইমামদের ইনাম দেবার কথা ঘোষণা করা হলো! এখন বলা হচ্ছে ইমামদের সরকারি প্রচারক হিসাবে ভাতা দেওয়া হবে। এ-ব্যাপারে ২২০/এস এম এ এম ই/এল/১২ সরকারি নির্দেশে বলা হয়েছে যে ইমামরা মুসলমানদের মধ্যে শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁদেরকে মুসলমানদের মধ্যে সরকারি প্রচারে লাগানো হবে। তাইতো ইমামদের সম্মেলনে পঞ্চায়েত নির্বাচনে তৃণমূলকে জয়ী করতে বলা হয়েছে। মুসলিম স্বার্থরক্ষা করার জন্য একটি সরকারি টাস্কফোর্স তৈরি হয়েছে। চেয়ারম্যান হলেন ওয়াকফ্ বোর্ডের চেয়ারম্যান অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি মহম্মদ আব্দুল গণি। এই টাস্কফোর্সের সদস্য করা হয়েছে মুসলমান ধর্মীয় নেতাদের। মমতা ইমামদের সম্মেলনে মুসলমান নারীদের মতো নমাজ পড়েছেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, ‘বন্দ্যোপাধ্যায়’ ত্যাগ করেছেন, কেবলমাত্র হিন্দুত্বের শেষ রেখাটি মুছে ফেলার জন্য সরকারি ফাইলে তিনি কেবলমাত্র মমতা হিসাবে স্বাক্ষর করেন! চাকরি, ছাত্রভর্তি, ছাত্রবৃত্তি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই মুসলমানদের সংরক্ষণে সরকারি ঘোষণা করা হয়েছে। একদিকে ইমামদের ইনাম, অপরদিকে অটো-চালকদের শায়েস্তা করার জন্য তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পাল চড়-থাপ্পড়, কানধরে ওঠবোস করার ‘ইনাম’ দিচ্ছেন। তিনি বলেছেন, ‘যা করেছি বেশ করেছি।’ গ্রন্থাগারমন্ত্রী যেমন বলেছেন ‘যা করেছি ঠিক করেছি, মুখ্যমন্ত্রীর অনুমোদন আছে’। তেমন পরেশ পালও মুখ্যমন্ত্রীর নীরব সমর্থনে আইনকে নিজের হাতে নিয়েছেন। তৃণমূল সাংসদ শিশির অধিকারী স্পষ্টাস্পষ্টি বলেছেন, ‘সংবাদপত্রকে আমরা টাকা যখন দেবো তখন আমাদের কথাই বলতে হবে।’ নেত্রী বলেছেন, নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করবো না করবো না করবো না। তিনি আরও বলেছেন, ‘কি পড়তে হবে তা এখনও বলিনি।’ তার মানে ভবিষ্যতে তাও মমতা ঠিক করে দেবেন। আসুন আমরা দু’হাত ঊর্ধ্বে তুলে মমতার ভজনা করি। বিরোধী নেত্রী মমতা, মুখ্যমন্ত্রী মমতা একেবারেই সিপিএমের প্রতিমূর্তি। নোনাডাঙার উচ্ছেদ-বিরোধী মিছিল যখন মমতা-আবাসের দিকে এগোচ্ছিল, তখন সেই মিছিলের উপর হামলা করা হয়। পুলিশ অসাড় হয়ে দাঁড়িয়েছিল। এর প্রতিবাদে একদা মমতার সমর্থক কৌশিক সেন, সুনন্দ স্যানাল, মহাশ্বেতা দেবী তীব্র সমালোচনা করেছেন এই হামলার। কৌশিক সেনের বক্তব্য— ‘‘বিরোধিতাকে সব সময়েই ‘চক্রান্ত’ বলা হচ্ছে’’। দরিদ্র মানুষের উপর অত্যাচার হচ্ছে অথচ শাহরুখ খানের কাছে বিগত আই পি এল-এর দরুন ২১ লক্ষ টাকা পাওনা। এর পরিবর্তে কি শাহরুখকে ব্রান্ড অ্যামবাসাডর করা হলো। তাইতো শাহরুখ বলেন, ‘দিদি যা বলবেন— তাই করব।’

বাম রাজত্বের রঙ্গকথা আর মা-মাটি-মানুষের রাজত্বের রঙ্গচিত্রের মিল পাচ্ছেন?

মাত্র এক বছর ক্ষমতায় এসেছে তৃণমূল কংগ্রেস। 'সোনার বাংলা' গড়তে দলকে এবং দলনেত্রীকে সময় দিতে হবে। নেত্রী বলেছেন, 'আপনারা আমাকে সময় দিন। আমি আপনাদের সোনার বাংলা গড়ে দেব।' নেত্রীর পদলেহী স্তাবকরা প্রচার শুরু করে দিলেন, নেতাজীর ভাবাদর্শ ও বাণীর যথার্থ উত্তরসাধিকা এসে গেছেন। আর চিন্তা নেই। ভারতসভায় শ্রেষ্ঠ আসনটি পশ্চিমবঙ্গ প্রায় বগলদাবা করলো বলে। গান বাঁধা হলো, 'নাই নাই ভয়, হবে হবে জয়, জিতে যাবে মমতা...।' তবে সব পেয়েছি-র এই রাজ্যে আপনারা সবই পাবেন। তবে একটু সবুর করুন। কথায় আছে, সবুরে মেওয়া ফলে। ভাল পেস্তা বাদাম দুধ ক্ষীর খেতে চাইলে এখন নিজের মুখটিতে সেলোটেপ লাগান। স্পিকটি নট। কথা বললেই বিপদ। নেত্রী চক্রান্ত চক্রান্ত বলে এমন হাল্লাগোল্লা শুরু করে দেবেন যে তাঁর দলদাসরা রাজ্যজুড়ে নাচন-কোঁদন করেও নেত্রীর মন জয় করতে পারবে না। মাঝখান থেকে কিছু নিরীহ উলুখাগড়া দলদাসদের হাতে বলি হয়ে যাবে। তবে ভয় নেই। আমাদের মমতাময়ী নেত্রী তাঁর দলের হাড়িকাঠে বলি হয়ে যাওয়া উলুখাগড়াদের পরিবারকে ক্ষতিপূরণ দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেবেন। খবরের কাগজে ছাপা হবে। মমতাময়ী দলের হাতে ভোগে যাওয়া মানুষটির বউয়ের চোখের জল মুছিয়ে দিচ্ছেন। ছবির তলায় লেখা থাকবে, 'চক্রান্তকারীদের নিহতদের পরিবারের দেখভাল করবে দল।' এতেই নিহতদের পরিবারের বউ মেয়েদের প্রাণপাখী খাঁচা ছাড়া হয়ে যাবে। দলের ভৈরবদের দেখভাল কী রকম চীজ তা গ্রামবাংলার মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছেন।

পরিবর্তনের ভাঁওতায় হাওয়া তুলে ক্ষমতায় আসার পর রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রী একাধিকবার দাবি করেছেন যে তিনি মাত্র ১০ মাসে যত উন্নয়নের কাজ করেছেন তা বিগত বামফ্রন্ট সরকার ৩৪ বছরে করতে পারেনি। ভাল কথা। তবে সেই সব উন্নয়নগুলির একটিও আমজনতা স্বচক্ষে দেখেছেন এমন দাবি কেউ করেছেন বলে এই অধম কলমচির জানা নেই। মনে পড়ে যায় প্রয়াত কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী সিদ্ধার্থশঙ্কর রায়ের কথা। জরুরি অবস্থা চলাকালে তিনি নিয়মকরে প্রতিদিন আধ ডজন উন্নয়ন প্রকল্প চালু করতেন। সংবাদপত্রের অফিসে পাঠানো সরকারি প্রেস রিলিজে দাবি করা হোত সেইসব উন্নয়ন প্রকল্পের ফলে পশ্চিমবাংলার মানুষ কেমন দুধে ভাতে আছে। জরুরি অবস্থায় সরকারি প্রেস রিলিজ যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে ছাপা বাধ্যতামূলক ছিল। সিদ্ধার্থবাবু দাবি করতেন, পশ্চিমবঙ্গের ১০০ শতাংশ গ্রামে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। রাজ্যের সমস্ত ব্লকে গ্রামীণ হাসপাতাল হয়েছে। কর্মসংস্থানে পশ্চিমবঙ্গ এখন দেশের এক নম্বর স্থানে। তখন সাংবাদিকরা মৌখিকভাবে আপত্তি জানালে সিদ্ধার্থবাবুদের দলদাসরা 'চোপ্ রও' বলে হুঙ্কার

গূঢ়পুরুষের কলম

দিতেন। সাংবাদিকদের ধোলাই দেওয়া হোত। জেলে পোরা হোত। পরে ১৯৭৭ সালে পরিবর্তনের স্লোগান দিয়ে সিপিএম দলের নেতৃত্বে বামফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এসে সিদ্ধার্থবাবুদেরই অন্ধ অনুসরণ করেছিল। উন্নয়নের ধূয়ো তুলে সিপিএমের হার্মাদবাহিনী রাজ্যজুড়ে ৩৪ বছর ধরে ব্যাপক লুঠতরাজ চালিয়ে ছিল। সেই একই চেনা পথের পথিক এখন মমতা এবং তাঁর দলের ভৈরবরা। উন্নয়নের পথের কাঁটা সাংবাদিকদের শিক্ষা দিতে দলের ভৈরবরা পথে নেমেছে। তাদের একটাই কথা, 'চোপ শা...। কথা বললে কালীঘাটে মায়ের (পড়ুন দিদির) ভোগে পাঠিয়ে দেব।' এই একই কথা শুনতাম জরুরি অবস্থা চলাকালে। পুলিশকে দিয়ে ময়দানে এনকাউন্টার করে মায়ের ভোগে পাঠানোর হুমকি দেওয়া হোত প্রকাশ্যে। সেই সময় খাঁড়া (পড়ুন পাইপগান) হাতে ঘুরে বেড়ানো কারণবারি সেবিত দলের ভৈরবদের সর্দার ছিলেন কংগ্রেসী তথ্য ও সংস্কৃতি মন্ত্রী সুব্রত মুখার্জী। এখন তিনি তৃণমূল কংগ্রেসের পঞ্চায়েত মন্ত্রী ও মুখ্যমন্ত্রীর প্রধান পরামর্শদাতা। একদা মমতা এই চির যুবক নেতার শিষ্যা ছিলেন। পরে গুরুমারা বিদ্যা শিখে তিনি সুব্রতবাবুকেই তাঁর রাজনীতির পাঠ শেখানোর ইস্কুলে ভর্তি করেন। মমতা প্রথমে সুব্রতবাবুকে মন্ত্রী করতে ইচ্ছুক ছিলেন না। অতীতে কংগ্রেসে থাকার সময় সোমেন-সুব্রত জোটের অপমানজনক ব্যবহারের কথা তিনি ভোলেননি। মুখে তিনি যতই বলুন না কেন, 'বদলা নয়, বদল চাই'। বাস্তবে ঠিক এর উল্টোটাই তৃণমূল নেত্রীর পছন্দের রাজনীতি। রাজ্যজুড়ে এখন যা চলছে তা বদল নয়, বদলার রাজনীতি। অবশ্যই নেত্রীর সম্মতিতে। সিপিএমের হার্মাদরা যখন দাপিয়ে বেড়াতো তখন একটা রঙ্গকথা মুখে মুখে ঘুরতো। এক যাত্রাপার্টির বাস হার্মাদরা পথে আটকে মোটা টাকা চাঁদা চেয়েছে। অত টাকা যাত্রাপার্টির ম্যানেজারের কাছে নেই। টাকা যোগাড় করে আনার ছুতোয় ম্যানেজারবাবু সটান থানায় চলে এসেছেন। থানার বড়বাবু, মেজবাবু, সেজোবাবু, ছোটবাবু সকলেই দিবানিদ্রা দিচ্ছেন। ম্যানেজারবাবু গলা খাঁকারি দিয়ে বললেন, 'স্যার, আমাদের পার্টির বাস কিছু লোক আটকে রেখেছে...।' পার্টির নাম শুনেই নিদ্রিত বড়বাবু থেকে ছোটবাবু, এমনকী থানার বাইরে ঘুমন্ত নেড়ি কুকুরটি পর্যন্ত তড়াক করে লাফিয়ে উঠলো। কী এত বড় সাহস, পার্টির বাস আটক করেছে। ওরে, লাঠি বন্দুক যা যা আছে সব নিয়ে চল। সব ব্যাটাকে পিটিয়ে কাবাব বানাবো। হঠাৎ ছোটবাবুর মনে হলো, লোকটা কেমন ভীতু ভীতু চোখে তাকাচ্ছে। লাল পার্টির নেতার দাপুটে দৃষ্টি নয়। ছোটবাবু জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাসের সামনে লাল শালু ছিল।' ম্যানেজারবাবু মিনমিনে গলায় বললেন, 'আজ্ঞে আমরা যাত্রাপার্টির লোক তো, যাত্রাদলের নাম লেখা শালু ঝোলানো ছিল।' এইবার বড়বাবুর হুঙ্কার শোনা গেল। 'এই শা...। তবে এতক্ষণ পার্টি পার্টি বলছিলি কেন? যাত্রাপার্টি আর লাল পার্টি এক হলো? আমাদের চমকাচ্ছিস্ পার্টির ভয় দেখিয়ে। ব্যাটাকে এখুনি গারদে ঢোকা।'

যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানের শিক্ষক অম্বিকেশ মহাপাত্রকে মুখ্যমন্ত্রীর অবাধ্য নেতাদের 'ভ্যানিস' করে দেওয়ার রঙ্গচিত্র প্রচারের অভিযোগে পিটুনি দিয়ে হাজতবাস করানো হয়েছে। সেকালের বাম রাজত্বের রঙ্গকথা এবং একালের মা-মাটি-মানুষের রাজত্বের রঙ্গচিত্রের মিল খুঁজে পাচ্ছেন কী? এই দুইয়ের মধ্যে বদলটাও লক্ষ্য করবেন। রঙ্গকথার প্রতিক্রিয়ায় সত্যি সত্যি কাউকে হাজতবাস, পিটুনি খেতে হয়নি। এই জমানায় রঙ্গচিত্রের প্রতিক্রিয়ায় বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন সম্মানীয় অধ্যাপককে মারধর করে থানায় ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে। এরপরেও যদি বলেন রাজ্যে উন্নয়নের বন্যা বইতে দেখছেন না, তবে আপনি একজন উন্নয়ন বিরোধী চক্রান্তকারী।

পুরাণের কাহিনী অস্থির তরুণ-মনকে শান্ত করতে পারে

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে পারস্পরিক হিংসা, হানাহানি, আক্রমণাত্মক মনোভাবকে শান্ত করতে কলকাতার কিছু নাম করা স্কুল মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষার নতুন পাঠক্রম চালু করতে চলেছে। সংবাদে প্রকাশ, এখন থেকে শিশুরা বেদগান, শ্লোকের আবৃত্তি ও গীতার উদ্ধৃতি সমূহের কিছু কিছু পাঠ বাধ্যতামূলকভাবে অভ্যাস করবে। অস্থির অশান্ত শিশুমনকে শান্ত করতে ও তা থেকে উদ্ভূত হিংসাত্মক আচার-আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে বেদ ও গীতার এই বাল্যকালীন অনুশীলন এক বড় ভূমিকা নেবে বলেই তথ্যাভিজ্ঞ মহলের বিশ্বাস। বিশেষ কিছু স্কুলে প্রথম থেকে অষ্টম শ্রেণীর মধ্যে ইতিমধ্যেই এই নতুন পাঠক্রম চালু হয়ে গেছে।

এই প্রসঙ্গে কলকাতার প্রখ্যাত মহাদেবী বিড়লা গার্লস হায়ার সেকেন্ডারী স্কুলের অধ্যক্ষা শ্রীমতী মালিনী ভগত বলেন, এই মন্ত্রোচ্চারণের মাধ্যমেই বর্তমান প্রজন্মের ছাত্র-ছাত্রীরা তাদের চিরাচরিত পরম্পরার সন্ধান পাবে। অনুভব করবে তাদের শিকড়ের টান। তিনি আরও বলেন, বেদমন্ত্রগুলিই পারে একে অপরের সঙ্গে সম্প্রীতির বন্ধন তৈরী করতে। তাঁর স্কুলে এই শিক্ষাবর্ষ থেকেই শ্লোকপাঠের অনুশীলন শুরু হবে।

শ্রীমতী ভগতের বক্তব্য অনুযায়ী শিশুদের মধ্যে সামাজিক মূল্যবোধ তৈরি করার শিক্ষা তাঁরা শুরু থেকেই চালু করতে চান। বেদমন্ত্র উচ্চারণ

যে মনকে একাগ্র করে নির্দিষ্ট বিষয়ের ওপর নিয়োজিত করতে সাহায্য করবে এ বিষয়ে শ্রীমতী ভগতের কোনও সন্দেহ নেই। শুধু তাই নয়, একত্রে কোরাস গান শিশুদের মনযোগী করে আরও শৃঙ্খলাবদ্ধ করবে। আর একটি নাম করা স্কুল লক্ষ্মণপত সিংহানিয়া অ্যাকাডেমী মন্ত্রোচ্চারণের অনুশীলন এই শিক্ষাবর্ষেই শুরু করবে— এমনটাই খবর। সংবাদসূত্র অনুযায়ী এই শিক্ষায়তনটি নৈতিক শিক্ষার মানোন্নয়নে সাপ্তাহিক ক্লাস নেওয়ার পরিকল্পনা ইতিমধ্যে করেছে। এই পাঠগুলির অঙ্গ হিসেবে বৈদিক শ্লোক আবৃত্তি, মহাকাব্যগুলি থেকে পাঠ, গীতার অংশ বিশেষ থেকে যৌথ পাঠাভ্যাস প্রভৃতি সংযোজিত হবে। বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষা শ্রীমতী মীনা কাকের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীরা অনেক সময়ই সব কিছু নিজেরা সামলে নিতে পারে না। এর থেকে তাদের মধ্যে একটা আক্রমণাত্মক মানসিকতার জন্ম হয়। ওষুধি হিসেবে বহু ভারতীয় ভাষার জননী সংস্কৃত শ্লোকের আবৃত্তি শিশু ও কিশোর মনের কাঙ্ক্ষিত ভারসাম্য রক্ষা করার সহায়ক হবে। এমনটাই তাঁর আশা।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, এই পরিকল্পনাকে সফল করতে বিদ্যালয়গুলি বর্তমানে অধ্যাত্ম জগতের বিশেষজ্ঞদের দিয়েই এই কাজ শুরু করেছেন। আমাদের চিরকালীন পরম্পরার রক্ষণে পরিকল্পনাগুলি ইতিবাচক ভূমিকা নেবে বলে ওয়াকিবহালমহল আশা করছেন।

৫ বছরের
গ্যারান্টী
ISI-2347
নির্মাতা ঃ
KUMAR PLASTICS PVT. LTD.
১৯২, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট কলকাতা-৭০০ ০০১
ফোন ঃ ২২২১-১৯৫১, ২২৪২-১৯৩০, ২২৪২-৫৪১০

EXPRESS TRADING AGENCIES
P-41, PRINCEP STREET (Ground Floor)
KOLKATA - 700 072

মমতার রকম-সকম

তথাগত রায়

২০১১ সালের মে মাসে পশ্চিমবাংলায় একটা আশ্চর্য ঘটনা ঘটেছিল। যে সব মানুষ কোনওদিনই মমতাকে, তৃণমূল কংগ্রেসকে বা কংগ্রেসকে সমর্থন করতেন না তার মধ্যে বহুজন চোখ বুজে মমতার দলকে ভোট দিয়েছিলেন। তার মধ্যে আমাদের দল, অর্থাৎ বিজেপি-র সমর্থক ছিলেন, এমনকী সিপিএম সমর্থক পর্যন্ত ছিলেন। কারণটা খুব সরল। মানুষ ৩৪ বছরের সিপিএম রাজত্বের খুনোখুনি, স্বৈরাচার, দলবাজী, ঔদ্ধত্য আর সহ্য করতে পারছিলেন না। নিমজ্জমান মানুষ যেমনি তৃণখণ্ড আঁকড়ে ধরে তেমনি করে মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে আঁকড়ে ধরেছিলেন সিপিএম সরকারকে সরানোর জন্য। তাঁদের নিশ্চয়ই দোষ দেওয়া যায় না— তাঁরা বলেছিলেন প্রথমে এই চৌত্রিশ বছরের পাপ বিদায় হোক— তারপর অন্য কিছু ভাবা যাবে।

সেইসব মানুষের বৃহদংশ আজকে, যখন নতুন সরকারের এক বছর হতে চলেছে, একটু অন্যরকম ভাবছেন। তাঁদের আজকে অনেকেরই মুখে শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন ইংরাজি প্রবাদ বচন, যার ভাষান্তর করলে দাঁড়ায় ''আমরা কি তপ্ত কড়াই থেকে আগুনের মধ্যে ঝাঁপ দিলাম,'' ''এ যে দেখছি অসুখের চাইতে ওষুধ আরও মারাত্মক'' এবং সবচেয়ে মারাত্মক, ''আমরা চেয়েছিলাম তাড়াতে হার্মাদ পেলাম এক উন্মাদ'' (অধীর চৌধুরী, কংগ্রেস নেতা)! বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি রাহুল সিনহা একটু অন্য ভাষায় বলেছেন, 'রঘু ডাকাতকে তাড়িয়ে কালু ডাকাতকে আনা হলো।' সম্ভবত এইটিই সবচেয়ে লাগসই উপমা, কারণ বামফ্রন্ট শাসনের চাইতে খারাপ কিছুই হতে পারে না, বর্তমান সরকার খারাপ, কিন্তু বামফ্রন্ট আরও অনেক, অনেক বেশি খারাপ।

কিন্তু বামফ্রন্ট তো এখন ক্ষমতায় নেই, আছেন মমতা। তৃণমূল নয়, মমতা। কারণ মমতা ছাড়া তৃণমূলের যেমন কোনও অস্তিত্ব নেই, তেমনি মমতার অঙ্গুলিহেলন ছাড়া তৃণমূলের কোনও নেতার এক কানাকড়ি সিদ্ধান্ত নেবার ক্ষমতা নেই। অতএব মমতা। এখন প্রশ্ন, এই প্রায় এক বছর আমাদের কেমন গেল?

নির্বাচনে বিরাট জয়ের পর মুখ্যমন্ত্রীর অন্যতম প্রধান কাজ ছিল মন্ত্রিসভা তৈরি। আমরা অবাক হয়ে দেখলাম পুলিশ এবং স্বাস্থ্য, এরকম দুটো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক মুখ্যমন্ত্রী নিজের কাছে রেখে দিলেন, এর সঙ্গে আরও দু-তিনটে ছোটখাটো মন্ত্রকও রেখে দিলেন। পুলিশ এবং স্বাস্থ্য, এই দুটো রাজ্য সরকারের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রক, যার পিছনে মন্ত্রীকে প্রচুর সময় দিতে হয়। বিদ্যুৎ রেখে দিয়েছিলেন, পরে সেটা মনীশ গুপ্তকে দিলেন। কিন্তু বাকি মন্ত্রকগুলোর বিতরণ দেখে অনেকেরই চোখ কপালে উঠল। সারাজীবন নাটকের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্রাত্য বসুকে কেন উনি শিক্ষামন্ত্রী করলেন এবং বাংলার অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক রবিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়কে কেন উনি কারিগরী শিক্ষার ভার দিলেন বোঝা গেল না। প্রযুক্তিগত শিক্ষা (যার সঙ্গে এই প্রবন্ধকার গত বাইশ বছর ধরে সম্পর্কিত) কার্যত দু'ভাগ হয়ে গেল— ব্রাত্যবাবু ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজগুলোর দায়িত্বে, রবিরঞ্জনবাবু পলিটেকনিক ও ডিপ্লোমা কলেজের দায়িত্বে। এর চেয়েও আশ্চর্য হচ্ছে আইনজ্ঞ এবং অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি নূরে আলম চৌধুরীকে পশুপালন মন্ত্রী করা।

১৫ আগস্ট আমাদের পবিত্র স্বাধীনতা দিবস, সেদিন মুখ্যমন্ত্রী পুলিশ বাহিনীর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন এবং তাঁদের কাছ থেকে স্যালুট নেন (যদিও এই ব্যাপারে প্রধান অনুষ্ঠানটি হয় ২৬ জানুয়ারি)। এই দিন টিভি খুলে দেখা গেল মুখ্যমন্ত্রী এক বিচিত্র সাজে সজ্জিত— রক্ষণশীল মুসলিম মহিলারা যে পোশাক পরে তিনিও সেই পোশাক পরেছেন। মুখমণ্ডলটা ঢাকেননি বটে, কিন্তু চিবুকের কাছে ফিতে বেঁধে বোহরা পরে মুসলিম মহিলাদের মতোই সেজেছিলেন। স্বাধীনতা দিবস মুখ্যমন্ত্রীর উপস্থিতিতে একটা ভাবগম্ভীর ব্যাপার হওয়া উচিত— এ তো 'ফ্যান্সি ড্রেস পার্টি' বা 'গো অ্যাজ ইউ লাইক' প্রতিযোগিতা নয়! মুখ্যমন্ত্রীর তো এটা স্বাভাবিক বেশ নয়, উনি তো শাড়িই পরেন, আজ হঠাৎ এই সং সাজার অর্থ কী? মুসলিমপ্রধান বাংলাদেশের বাঙালী মহিলা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, এমনকী খালেদা জিয়াও তো এমন পোশাক পরেন না!

আমরি (AMRI) হাসপাতালে আগুন লাগল, বহু রোগী এবং বেশ কিছু কর্মী পুড়ে মারা গেলেন। মমতা ঘটনাস্থলে এলেন— সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু তারপর ওঁর ওখানে সারাদিন দাঁড়িয়ে থাকার কোনও দরকার ছিল কি? ওখানকার পরিস্থিতি তো তারপর দমকল-কর্তা ও পুলিশ কর্তারা সামলাবেন, দমকলমন্ত্রীও দাঁড়িয়ে থাকতে পারেন, কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী! মুখ্যমন্ত্রী যদি দমকলকর্তা ও পুলিশকর্তার কাজ করেন তাহলে মুখ্যমন্ত্রীর কাজটা করবেন কখন?

দক্ষিণ ২৪-পরগণার মগরাহাটে চোলাই খেয়ে বেশ কিছু মানুষ মারা গেলেন। চোলাই-মৃতদের পরিবারের জন্য সরকার থেকে দু' লক্ষ টাকা করে সরকারি অনুদান ঘোষণা করা হলো। করলেন অবশ্যই মমতা, কিন্তু এটা কী করলেন? যারা বেআইনী চোলাই খায় তাদের মৃত্যুসংবাদ মাঝে মাঝেই পাওয়া যায়, কারণ নেশার তীব্রতা বাড়ানোর জন্য চোলাইতে মিথাইল অ্যালকহলের মতো মারাত্মক বিষ মেশানো হয়। এসব কথা চোলাইখোরদের না জানার কথা নয়। তা সত্ত্বেও তারা ঝুঁকি নিয়ে চোলাই খেয়েছে। যে কোনও মৃত্যুই দুঃখজনক, বিশেষ করে মৃতের পরিবারের জন্য। কিন্তু এরকম ঝুঁকি নিয়ে যারা চোলাই খায় তাদের কি দু' লক্ষ টাকা দেওয়া উচিত?

এর পরেও দুটো কথা আছে। প্রথম, দুষ্টু লোকে বলছে, মমতা এটা করেছিলেন শুধু মুসলিম ভোট পাবার জন্য, কারণ মৃত চোলাইখোরদের বেশিরভাগই মুসলমান। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, একই জিনিস মমতা ও বুদ্ধদেব

দু'জনেই করেছিলেন রিজওয়ানুরের মৃত্যুর পর। না হলে প্রেমঘটিত মৃত্যু বা আত্মহত্যা তো অনেক হয়েছে তার কোনটায় মুখ্যমন্ত্রী বা বিরোধী নেত্রী দৌড়েছেন কি? দ্বিতীয়, তৃণমূল ক্যাডাররা গিয়ে মৃতদের বাড়িতে হুমকি দিয়ে এসেছে, খবরদার, প্রাণের মায়া থাকে তো দু' লক্ষ টাকা ক্ষতিপূরণ দাবি করতে যাবি না। এটাই স্বাভাবিক, কারণ রাজ্য-সরকারের তো ভাঁড়ে মা ভবানী!

পার্ক হোটেলের বাইরে যে অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান মহিলাকে গাড়িতে তুলে ধর্ষণ করা হলো সে ব্যাপারে মমতার ভূমিকা ন্যক্কারজনক। প্রথমে বললেন— ধর্ষণই হয়নি, সব 'সাজানো ঘটনা'। তারপর পুলিশের যুগ্ম কমিশনার শ্রীমতী দময়ন্তী সেন-কে (যিনি অভিযোগকারিণী মহিলার কথা বিশ্বাস করে অপরাধের তদন্ত করছিলেন এবং মূল ধর্ষণকারী কাদির খান বাদে বাকি সব অপরাধীদের ধরেছেন) ধমক-ধামক করলেন এবং শেষপর্যন্ত তাকে বদলি করে দিলেন। এর ফলে কি নারীধর্ষণকারীরা উৎসাহ পাবে না? ইদানীংকার মধ্যে মমতার দুটি কীর্তি নিয়ে প্রচুর সমালোচনা হয়েছে এবং সঙ্গতভাবেই হয়েছে। একটি হলো— ক্লাব এবং ইমামদের অনুদান দেবার ব্যবস্থা করা। এটি আর কিছুই নয়, সরকারি পয়সা খরচ করে ভোট কেনার চেষ্টা। এবং এটি করা মমতার পক্ষে যথেষ্ট মুস্কিল। কারণ এতে সংবিধানের ১৪নং অনুচ্ছেদ লঙ্ঘিত হচ্ছে— তাছাড়া ইমামদের অনুদান দেওয়ায় সংবিধানের মুখবন্ধ বা ভূমিকাটাই লঙ্ঘিত হচ্ছে। আর একটি হলো লাইব্রেরিতে কি কি কাগজ রাখা যাবে সে সম্বন্ধে মমতার ফতোয়া। এটির সপক্ষে যুক্তি দিতে গিয়ে মমতা ল্যাজে-গোবরে হয়েছেন। একবার বললেন ব্যয়সংকোচের জন্য কাগজের সংখ্যা কমানো হচ্ছে, আর একবার বললেন 'মুক্তচিন্তার প্রসারের' জন্য এই ব্যবস্থা। কিন্তু শিশির অধিকারী হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে বললেন, যে সব কাগজ সরকারের কথা লেখে না সরকারের অধিকার আছে তাদের গ্রাহক না হবার। শিশিরবাবুর এই যুক্তি আইনের ধোপে টিকবে না, সম্ভবত শিশিরবাবুও জানেন টিকবে না, জেনেশুনেই মন্তব্য করেছেন।

এতেই শেষ নয়, আরও আছে। রেল বাজেট নিয়ে মমতার কেরামতি, অটোর ভাড়া বাড়তে না দেওয়া, যে সব দলনেতা একটু প্রাধান্য পেয়ে যান তাঁদের ডানা ছাঁটা, রাইটার্সে না বসে সারা রাজ্যে দৌড়ে বেড়ানো, এ সবই মমতার বিচিত্র প্রশাসনের প্রতি অঙ্গুলিনির্দেশ করছে। প্রশ্ন হচ্ছে, মমতা কি জানেন না যে এগুলি করে তিনি হাস্যাস্পদ হচ্ছেন? তাহলে কেন করছেন?

এই 'কেন'-র উত্তর পেতে হলে মমতার বিরোধী নেত্রী থাকাকালীন আচরণের দিকে তাকাতে হবে। আমরা দেখতাম, যেখানে অত্যাচার হচ্ছে, যেখানে সিপিএম খুন করছে, নির্যাতন করছে, দলবাজি করছে, সেখানেই মমতা দৌড়ে চলে যাচ্ছেন (যেখানে যেতে পারেননি সেখানে বিজেপি-র সাহায্য নিয়ে দৌড়তে এবং পরে তা অস্বীকার করতে, তাঁর বাধেনি, যেমন নন্দীগ্রাম)। আমরা দেখেছি এবং একনিষ্ঠ আচরণের ভূয়সী প্রশংসা করেছি, এখনও করি। কিন্তু গণ্ডগোল হচ্ছে, রাজনীতি বলতে মমতা এইটাই বোঝেন, আর কিছু বোঝেন না। তাই তিনি দৌড়ে বেড়ান আজ উত্তরবঙ্গ, কাল জঙ্গলমহল, পরশু সুন্দরবন, তরশু ডোমজুড়। কোথাও তিনি বিমল গুরুং-এর সঙ্গে কথা বলেন, কোথাও মাওবাদী দমনের ব্যাপারে খোঁজ নেন— আর সুন্দরবন গিয়ে তিনি ইস্টিমার চালান, ডোমজুড়ে কাপড়ে পুঁতি সেলাইয়ের চেষ্টা করেন। বিমল গুরুং-রা বা মাওবাদীরা রাজ্যের সমস্যা বটে, কিন্তু এগুলি তো রাজ্যের প্রধান সমস্যা নয়! কলকাতাকে লন্ডন বানানো বা দার্জিলিংকে সুইজারল্যান্ড বানানোও পশ্চিমবঙ্গে সরকারের আশু কর্তব্যের মধ্যে পড়ে না! রাজ্যের প্রধানতম সমস্যাবলীর মধ্যে আছে আর্থিক দেউলিয়া অবস্থা, সর্বব্যাপী বেকারত্ব, শিল্পপতিদের রাজ্যে লগ্নীতে অনীহা, বিদ্যুৎসংকট, চাষীদের শস্যের দাম না পাওয়া ইত্যাদি। এগুলি সম্বন্ধে মমতার কি চিন্তা? এগারো মাসে তিনি এর সমাধান না করতে পারুন, কি ভাবে সমাধানের পথে এগোবেন তার একটা রূপরেখা তো দেখাতে পারেন, হদিশ তো দিতে পারেন!

> **আশু সমস্যা নিয়ে মমতার কোনও চিন্তাই নেই। চিন্তা উনি করতেই পারেন না। চিন্তা করতে যে মানসিক গঠন দরকার, যে ধৈর্য দরকার, পাঁচজন মন্ত্রী ও আমলার সঙ্গে বসে আলোচনা করার যে মানসিকতা দরকার সেটা সৃষ্টিকর্তা ওঁকে দিয়ে পাঠাননি। উনি এসব পারেন না, করবেনও না, অন্য কারুকে করতে দেবেনও না, কারণ তাহলে সেই অন্য কেউ ওঁকে ছাপিয়ে যেতে পারে।**

অতীব দুঃখের বিষয়, এইসব আশু সমস্যা নিয়ে মমতার কোনও চিন্তাই নেই। চিন্তা উনি করতেই পারেন না। চিন্তা করতে যে মানসিক গঠন দরকার, যে ধৈর্য দরকার, পাঁচজন মন্ত্রী ও আমলার সঙ্গে বসে আলোচনা করার যে মানসিকতা দরকার সেটা সৃষ্টিকর্তা ওঁকে দিয়ে পাঠাননি। উনি এসব পারেন না, করবেনও না, অন্য কারুকে করতে দেবেনও না, কারণ তাহলে সেই অন্য কেউ ওঁকে ছাপিয়ে যেতে পারে। যেমন হয়েছিল বর্তমানে ওঁর মন্ত্রী সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের ক্ষেত্রে ২০০৫ সালে। সন ২০০০ থেকে ২০০৫ পর্যন্ত সুব্রতবাবু কলকাতার মেয়র হিসাবে আর যা-ই করুন, কর্পোরেশনটাকে আর্থিকভাবে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার একটি বলিষ্ঠ উদ্যোগ নিয়েছিলেন, সফলও হয়েছিলেন। তার ফলে মমতার কোপে পড়লেন এবং তৃণমূল থেকে বহিষ্কৃত হলেন। বেরিয়ে গিয়ে বলেছিলেন, মমতার চরিত্রের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে পরশ্রীকাতরতা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী যদি নিজের ক্যাবিনেট সঙ্গীদের ব্যাপারে পরশ্রীকাতর হন, তাহলে সেই রাজ্যকে একমাত্র ঈশ্বরই বাঁচাতে পারবেন।

চৌত্রিশ বছর ধরে সিপিএমের শয়তানি, দলবাজি, খুনখারাপি, স্বৈরাচার মানুষ দেখেছেন, তার আগের পাঁচ বছর কংগ্রেসের একই কীর্তি দেখেছেন। গত এগারো মাস ধরে তৃণমূলের কীর্তি দেখছেন। তাহলে বাকি রইল কাকে দেখার? যে দল গুজরাত, মধ্যপ্রদেশ, হিমাচল, ছত্তিশগড়, পাঞ্জাব, ঝাড়খন্ড ইত্যাদি রাজ্যে সুশাসন কাকে বলে দেখিয়ে দিয়েছে, তাকেই শুধু দেখা বাকি আছে।

পরিকাঠামোর পরিবর্তন না হলে বেহিসেবী শিশু মৃত্যুর কোনও কৈফিয়ত নেই

সুব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়

পশ্চিমবঙ্গে ৩৪ বছরের বাম শাসন ধ্বংস হয়ে শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তৃণমূল দলের সরকার ক্ষমতায় এসেছে গত বছর মে মাসে। একথা হয়ত অনেকেই মানবেন যে কেবলমাত্র দল গুছিয়ে নিয়ে নিজেদের লোককে কামাবার ব্যবস্থা করা ছাড়া, বাংলার মানুষের অন্য অনেক জরুরি পরিষেবার নিধন করার মতো স্বাস্থ্য-পরিষেবাটিকেও রসাতলে পাঠিয়ে দিয়েছিল সিপিএম চালিত সরকার। জনতার ভালমন্দের এই ২৪ ঘণ্টার ইজারাদারটির তার জনগণ নামে লালিত; ৫ বছর সালিয়ানা ভোট হাতিয়ে নেওয়া গৃহপালিত প্রাণীটির প্রাণ বাঁচানো বা তার ছানাপোনাদের বেঁচেবর্তে রাখার ব্যাপারে কোনও মাথাব্যথা ছিল না। তার ভুরিভুরি উদাহরণ এখন বসন্ত রুগীর অনবরত গুটি বেরোনোর মতো রাজ্যব্যাপী হাসপাতালগুলিতে অকাতরে শিশুমৃত্যুর পরিসংখ্যানেই উঠে আসছে। বেশকিছু নামকরা স্বাস্থ্য পরিষেবা সংক্রান্ত সংস্থা পশ্চিমবঙ্গে শিশুমৃত্যুর এই অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণ অনুসন্ধানে নানান সমীক্ষা চালিয়েছে। পর্যবেক্ষণগুলি প্রকাশিতও হতে শুরু করেছে। তার আলোচনায় পরে যাওয়া যাবে।

গত সরকারের কীর্তি :

জনদরদী সিপিএম সরকারের এক সময়ের মহাকৌলিন্যধারী সংখ্যালঘু মামু মহম্মদ সেলিমের কুকীর্তিটি এই সুবাদে ফাঁস হয়ে যাওয়ার কথা অনেকেই জেনেছেন। শিশুমৃত্যুর আলোচনায় বিশেষ করে প্রসবকালীন মৃত্যুও একটি বিশেষ আলোচ্য বিষয় হওয়ায় ঘটনাটি প্রাসঙ্গিক। হাসপাতালে হাসপাতালে যেখানে একান্ত স্থানাভাব, সরকারের 'ভাঁড়ে মা ভবানী'— সেই সময় স্রেফ ক্ষমতায় থাকার সুবাদে মহম্মদ সেলিমের স্ত্রী কলকাতার একটি নামী হাসপাতালে চাকরী করার সুবিধেকে কাজে লাগিয়ে সম্পূর্ণ বেআইনীভাবে অতিরিক্ত প্রায় ৩ হাজার বর্গফুট ফুট জায়গা দখল করেছিলেন। কথাটি তোলার কারণ হলো ন্যাশানাল রুরাল হেলথ মিশনের (এন আর এইচ এম) সুপারিশ অনুযায়ী জন্মহারের বৃদ্ধির সঙ্গে তাল রেখে ও জন্মকালীন সমস্যাগুলি কাটিয়ে উঠতে রাজ্যে রাজ্যে সিক- নিওনাটলি কেয়ার ইউনিটগুলি (এসএনসিভি) স্থাপন করার কথা। প্রত্যেকটির খরচ ১ কোটি টাকা। নতুন সরকারের চাপে মহানুভব মহম্মদ সেলিমের স্ত্রী তাঁর জবরদখলকৃত কয়েক হাজার ফুট থেকে পাততাড়ি গোটাবার পরই সেখানে একটি শিশুদের জন্য নির্দিষ্ট এস এন সি ইউ-র নির্মাণকার্য প্রায় শেষ হতে চলেছে। কিছুদিনের মধ্যেই সেটি চালু হয়ে যাওয়ার কথা। এই উদাসীনতা ও অসততার ঘটনাটিকে পর্যালোচনা করলেই পূর্ববর্তী সরকারের পরিকল্পনা ও শিশুস্বাস্থ্য সম্বন্ধে সদিচ্ছার আভাস পাওয়া যায়।

	মাস	শিশুমৃত্যুর সংখ্যা	হাসপাতালের নাম
১.	জুন ২০১১	২২	বি সি রায় শিশু হাসপাতাল
২.	অক্টোবর ২৯-৩১ ২০১১	২৬	বহরমপুর জেলা, জঙ্গিপুর মহকুমা
৩.	অক্টোবর ১৭-২৮ ২০১১	১২	বর্ধমান মেডিকেল কলেজ
৪.	অক্টোবর ২৫-২৮ ২০১১	১৭	বি সি রায় শিশু হাসপাতাল
৫.	জানুয়ারি ১৮, ২০১২	৭	মালদা জেলা হাসপাতাল
৬.	জানুয়ারি ১৯, ২০১২	১৫	মালদা জেলা হাসপাতাল
৭.	ফেব্রুয়ারি ২০১২	৮	মালদা জেলা হাসপাতাল

টাটকা খবর :

যাইহোক, এতো হলো মৃত সরকারের গল্প। আজকের সরকার গদীতে বসার পর ওই অবহেলিত শিশু-স্বাস্থ্য-ব্যবস্থার ফসল হিসেবে হঠাৎই যে মৃত্যু-মিছিল শুরু হয় তার কিছুটা তথ্য এরকম।

এই হাসপাতালওয়ারী পরিসংখ্যানগুলি ছাড়াও বাঁকুড়া, বীরভূম ও খোদ কলকাতাতেই গত ৮ মাসে প্রায় ১০০ শিশুর মৃত্যু হয়েছে। প্রসঙ্গত দেখা যায় শিশুমৃত্যুর এই অপ্রতিহত

ধারা রাজ্যে শুধু নয়, সমগ্র পূর্ব ভারতে শিশু সংক্রান্ত সর্ববৃহৎ বিশেষজ্ঞ হাসপাতাল বি সি রায় থেকেই শুরু হয়।

এমন অকাল মৃত্যুকে অনেকে দার্শনিক মোড়কে বিধাতার 'সেরা অবিচার' (ultimate injustice) বলে হালকা করে দিতে চান। আমাদের প্রাচীন পরমায়ু তত্ত্বকে মেনে নিলে তো আর গোল বাঁধে না। সেখানে তো বলাই আছে যে যার পূর্বনির্ধারিত আয়ু নিয়ে পৃথিবীতে আসে। হায়! এই সব অকালমৃতেরা কি তাহলে 'শূন্য' পরমায়ু নিয়ে ভূমিষ্ঠ হলো! মানতে কষ্ট হয় যখন খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যায় অকালমৃতদের প্রায় সকলেই সরকারি হাসপাতালেই মৃত্যুবরণ করেছে। প্রাইভেট হাসপাতাল থেকে কোনও মৃত্যুর খবর সংবাদ-সংস্থায় এসেছে বলে শোনা যায়নি।

কর্তাদের বাণী :

তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া জানাতে এমন মর্মন্তুদ পরিস্থিতিতে অনেক সময়ই হাসপাতালগুলির কর্তাব্যক্তিরা বেফাঁস মন্তব্য করে বসছেন। বর্ধমান মেডিকেল কলেজে সদ্য সন্তানহারাকে সান্ত্বনা দিয়ে কর্তৃপক্ষ সময়মতো শিশু সন্তানকে হাসপাতালে নিয়ে না আসাকেই কারণ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এমনই একজন বেচারাম টুডুর চৈতন্য উদয় করাতে গেলে হতভাগ্য মানুষটি জানিয়েছে লোকের কাছে চেয়ে বাস ভাড়া জোগাড় করে একান্ত নিরুপায় অবস্থাতেই সে স্ত্রীকে নিয়ে এসেছিল। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী অবশ্য এক ধাপ এগিয়ে শিশুর জন্মকালীন নিরাপদ ওজন ১.৫ কেজি হওয়া উচিত বলে বিশেষজ্ঞের মতামত দিয়েছেন। আশ্চর্যের বিষয় এমন করুণ অকালমৃত্যুগুলির পরিপ্রেক্ষিতে বি সি রায় হসপিটালের অধিকর্তা দিলীপ পাল এক নিষ্করুণ প্রতিক্রিয়া জানিয়ে বলেন, এইসব শিশুর দল বেঁধে মৃত্যু ঘটায় অবাক হবার কিছু নেই। অত্যন্ত আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। গড়ে প্রতিদিন ৩০০ করে শিশু হাসপাতালে চিকিৎসা করায়। যেমন এই বছরের ১৩ জানুয়ারি ৩৬২ জন নবজাতক ভর্তি হলেও তাদের মধ্যে মাত্র ৫ জন মারা যায়। এটা কি অস্বাভাবিক?"

প্রশাসনের আর এক কর্তাব্যক্তি— স্টেট ডাইরেক্টর অফ মেডিক্যাল এডুকেশন ডঃ সুশান্ত বন্দ্যোপাধ্যায় মালদায় গণ শিশুমৃত্যুর ক্ষেত্রে প্রায় একইরকম অসাড় প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেছেন, ''যতগুলি শিশু হাসপাতালে ভর্তি হলো তাদের সকলেই যে বাঁচবে এমন কোনও গ্যারান্টি কখনওই দেওয়া যায় না। অনেক সময়ই হাসপাতালে পরিকাঠামোগত ত্রুটি কিছু হয়ত থেকেই যায়, আবার অনেক সময়ই শিশুগুলিকে প্রায় মরণাপন্ন অবস্থাতেই আনা হয়। হাসপাতাল কর্মী বা প্রশাসনের তরফে অবহেলাই তাদের মৃত্যুর কারণ— এমনটা বলা কখনই ঠিক নয়।"

একটি মৃত্যু :

বিবৃতিটির অন্তঃসারশূন্যতা বোঝাতে নবদ্বীপের সুনীতার মর্মন্তুদ অভিজ্ঞতাই যথেষ্ট। এক বছরের ছেলেকে বি সি রায়ে শ্লেষ্মাজনিত সংক্রমণের জন্য নিয়ে এসেছিলেন সুনীতা। মারা যাবার ১ ঘণ্টা আগে কর্তব্যরত নার্সদের তিনি কোনও ডাক্তারবাবুকে ডাকতে বলেন। সুনীতাকে বলা হয়েছিল, 'তাদের মতো ভিখারীরা এক পয়সা না দিয়ে হাসপাতাল থেকে সেবা নিতে আসে। 'যাইহোক, কোনও ডাক্তারবাবু তো আসেননি আর ছেলেও বাঁচেনি। দুর্দশা চরম করতে প্রতিবাদরত সন্তানহীনা সুনীতাকে নিরাপত্তারক্ষীদের সাহায্যে হাসপাতাল থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়।যাইহোক, উদাহরণ দিতে থাকলে এই মৃত্যু-বারমাস্যা শেষ করা মুশকিল হবে। তাই এই মড়ক ঠেকাতে সরকারি স্তরে ভাবনা-চিন্তা বা পরিকল্পনার রূপরেখা সম্বন্ধে এক নজর দেখা যাক।

নিদান :

অরগানাইজেশন ফর ইকনমিক কো-অপারেশন অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (ও ই সি এ ডি) সমীক্ষা অনুযায়ী স্বাস্থ্য পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে সবশেষ থেকে ভারতের স্থান অষ্টম। জি ডি পি-র মাত্র ১ শতাংশ স্বাস্থ্য পরিষেবায় ব্যয় করা হয়। অবস্থার পরিবর্তন ঘটাতে রাজ্যের ক্ষেত্রে কোনও উদ্দেশ্যই চোখে পড়েনি। এমনই এলোমেলো অবস্থা দেখে একটি সরকারি হাসপাতালের অধ্যক্ষ আশঙ্কা ব্যক্ত করে বলেছেন যে বর্তমান বছরে ৪০০০০ হাজার শিশু মারা যায়। এমনটা চলতে থাকলে সংখ্যাটা খুব শীঘ্রই ৫৫ থেকে ৬০ হাজারে পৌঁছে যাবে। সমীক্ষায় যে জিনিষটির ওপর সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে তা হলো আগে বলা এস এন সি ইউ। পুরুলিয়ায় ২০০৩ সালে রাজ্যের প্রথম ইউনিটটি স্থাপন করার পর নতুন ইউনিট চালু করার ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়নি। বর্তমানে ১৮টি জেলায় (কলকাতা সহ) মাত্র ৮টি এস এন সি ইউ চালু আছে। এখানে উল্লেখযোগ্য এই অত্যাধুনিক ব্যবস্থা সম্বলিত ইউনিটগুলিতে মূলত রুগ্ন নবজাতকদের পক্ষে একান্ত জরুরি radiant warner, pulse oxymetive, infusion pump এর মতো জীবনদায়ী বন্দোবস্ত থাকে। ১ কোটি টাকা মূল্যের এই ইউনিটগুলির টাকা ন্যাশানাল রুরাল হেলথ মিশনের (এন এইচ এ এম) দ্বারাই অনুমোদিত হয়। মজার কথা কেন্দ্র যে কোনও জেলা হাসপাতালে তিন হাজার প্রসব হলেই ১টি এস এন সি ইউ খোলার অনুমোদন দিলেও বর্তমান রাজ্য সরকার প্রসবের সংখ্যাটিতে ৫ হাজারে বর্ধিত করে দিয়েছে। স্বাস্থ্য দপ্তরের এক অধিকর্তার কথায়— এই সংখ্যায় পৌঁছানো দুঃসাধ্য। তাই নির্দিষ্ট সময়সীমায় ৩২টি এস এন সি ইউ খোলার কেন্দ্রীয় লক্ষমাত্রা পূরণ করাও প্রায় অলীক বলেই মনে হয়।

আর একটি সমীক্ষা অনুযায়ী সাব সেন্টার ও প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রগুলিতে বাস্তবে ৩৬০০ ডাক্তারের প্রয়োজন থাকলেও মাত্র ১১০০ ডাক্তার কর্মরত আছেন। ওদিকে ১৯৯৩টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্রের দরকার থাকলেও মাত্র ৯২৪টি বাস্তবে কর্মক্ষম আর ৩৩ হাজার প্রয়োজনীয় স্বাস্থ্যকর্মীর জায়গায় কর্মরত আছেন মাত্র ১৩০০০। এই রোগাক্রান্ত পরিকাঠামোর 'পরিবর্তন' না হলে বেহিসেবী শিশু মৃত্যুর কৈফিয়ত হিসেবে 'শেষ অবস্থায় নিয়ে আসা' 'মানসিক সজাগতার অভাব' বা ওপরওলার নির্ধারিত 'পরমায়ু তত্ত্ব' মেনে নেওয়া ছাড়া আর উপায় নেই।

শিশুদের চিকিৎসায় অবহেলা দিনে দিনে বাড়ছে

রমাপ্রসাদ দত্ত

ছোটদের চিকিৎসার ব্যাপারটা সহজ করার জন্যে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। সকলের নাগালে ঠিকভাবে পৌঁছোনোর পথ সুগম হওয়া চাই। নানা স্তরের দালাল ধরে এখনও শিশুদের চিকিৎসা করাতে হয়— এটা সমস্যা বৈকি।

'সুখী শিশু জাতির গর্ব' বড় গলায় সরকারি প্রচারে বলা হোত। এখনও ওই ধরনের বাক্য বিজ্ঞাপনে থাকে। তার সঙ্গে জানানোও হয় রাষ্ট্রের পক্ষ থেকে শিশুদের জন্যে কি কি করা হচ্ছে। কোন্ কোন্ সুযোগ পাবার অধিকার শিশুদের রয়েছে তাও জানানো হয় স্পষ্ট ভাষায়। প্রচারে কোনও ঘাটতি বা কমতি না থাকলেও ঘোষণা কতটা রূপ নিচ্ছে তার যথাযথ খতিয়ান মেলা কঠিন। আর আমাদের দেশে পরিসংখ্যানের ভোজবাজির খেলা রয়েছে। যার মাধ্যমে সহজেই বোঝানো যায় শিশু কল্যাণের কাজ দ্রুতগতিতে এগিয়ে চলেছে দেশজুড়ে। সরকারি ব্যয়বরাদ্দ ঠিক আছে। কিন্তু তা কতটা এবং কতদূর পৌঁছোচ্ছে— সে হিসেবে জল থাকছে বড় বেশি। আমাদের জানা আছে, সরকারি ব্যয়বরাদ্দের ৯০ শতাংশের বেশি টাকা কর্মীদের বেতন দিতে শেষ হয়। বাকি দশ শতাংশে অনেক রকম খরচ সামলে মূল উদ্দেশ্যে ব্যয়ের জন্যে কতটা থাকে? সেই টাকারও কিছুটা উড়ে যাবে নানাভাবে। শেষে কি থাকবে? কতটা কাজ হবে?

শিশু কল্যাণ ব্যাপারটা মোটেই সহজ নয়। জন্মের পর থেকেই জাতির দায়দায়িত্ব থাকে শিশুর প্রতি। কারণ সেই শিশু ভাবী দিনের নাগরিক। অপুষ্টি, অস্বাস্থ্য, অসুখ তাদের ঘিরে থাকলে অগ্রগতির অনেক কাজই বাধা পায়। এরই অনুষঙ্গ হিসেবে চলে আসে অশিক্ষা, অজ্ঞতা। সব কিছুর মূলে থাকে অভাব। দেশের সব শিশুকে সমানভাবে দেখার কথা বলা হলেও সমদৃষ্টি বজায় রাখা কঠিন। অভাব বাধা হয়ে ওঠে অস্তিত্ব রক্ষার ক্ষেত্রে। কারণ দেশের কয়েক কোটি শিশুর কাছে জীবন মানে মৃত্যুর জন্যে প্রতীক্ষা। চারপাশে যে ছবি দেখি তার আড়ালে রয়ে যায় আরও বেদনার চিত্রমালা। অনেক সময় মনে হয় এ যেন অন্তহীন করুণ কাহিনী। শিশুরা জন্ম নিলেও তারা সব কিছু পায় না। নানাভাবে বঞ্চনার শিকার তারা।

অভাবের দরুণ অপুষ্টি আর অসুখে ভোগে শিশুর জননী। গর্ভধারণের পর থেকে শিশুর জন্ম পর্যন্ত জন্মদাত্রী ঠিকমতো পুষ্টি না পাওয়ার দরুণ দুর্বল শিশুর জন্ম হয়। অনেক শিশু জন্মের পরেই মারা যায়। একটা বড় অংশ মারা যায় তাদের একবছর বয়স হওয়ার আগেই। পাঁচ বছরের মধ্যে মারা যাওয়া শিশুদের সংখ্যা কম নয়। এরমধ্যে সবরকম প্রতিকূলতা পেরিয়ে কিছু শিশু বেঁচে থাকে। কিন্তু তাদের বলা চলে শৈশবহীন শিশু। সরকারি দয়াদাক্ষিণ্যের যেটুকু ছিঁটেফোঁটা শিশুদের কাছে পৌঁছোয় তারই জোরে প্রাণরক্ষার প্রাণান্তিক লড়াই চালায়। অপুষ্টি অসুখ ঘিরে ধরে। আর তারমধ্যেই বোধহীন জন্মদাতারা ক্রমাগত জীবসৃষ্টির কাজ চালিয়ে যায়।

'নির্বিচার জন্মদান নিষ্ঠুর পাপ'— এই সরল সত্যটা সরাসরি বলা যাচ্ছে না সকলকে। বিশেষ করে এদেশের মুসলমান সমাজকে। এখনও দেখা যাচ্ছে, প্রায় প্রতিবছরে গর্ভবতী নারীরা হাসপাতালে ভর্তি হয় অপুষ্ট শরীরে। গর্ভস্থ সন্তান কোন অবস্থায় থাকে চিকিৎসকরা অনুমান করতে পারেন। অপুষ্টিতে ভোগা প্রসূতি হয়তো আন্দাজ করতে পারে, যাকে গর্ভধারণের পর জন্ম দিল তার অবস্থা। অনেক

সময় শিশুদের বাঁচানো কঠিন হয়। আবার যদি বা প্রাণরক্ষা করা যায় তার দরুণ ব্যয় হবে অনেক টাকা। অনেক হাসপাতালে সে ব্যবস্থা নেই। যেসব শিশু তার মধ্যে রক্ষা পায় তার একটা বড় অংশ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধী হয়। শিশুর জন্মের পর থেকে ছ' বছর পর্যন্ত

কোন শিশু বড় হয়ে কোন দলের সমর্থক হবে— তার অনুমান না করে শিশু কল্যাণের ক্ষেত্রে সার্বিক উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। এরকম ঘোষণা করতে পারবেন কি এদেশের কোনও রাজনৈতিক দলের নেতারা?

পোলিও টীকা খাওয়ানোর গুরুত্ব বুঝতে চায়নি এদেশের মুসলমান সমাজ। মেয়েরা রাজি হলেও নানারকম ধুয়ো তুলে ধর্মের নাম করে আপত্তি জানিয়েছে পুরুষরা। একটি ছেলে বা মেয়ে পোলিওতে আক্রান্ত হলে সে রাষ্ট্রের বোঝা হয়ে ওঠে জীবন বিড়ম্বিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। 'জমিতে অধিক শস্য ফলাও' নীতিতে মুসলমান পুরুষরা অধিক সন্তান উৎপাদনে তৎপর এখনও। যাদের জন্ম দিচ্ছে তাদের প্রতি কোন দায়দায়িত্ব থাকার ব্যাপার নেই। আল্লার নাম করে ছেড়ে দাও। যেটা বাঁচার বাঁচবে, যেটা যাবার যাবে। এধরনের মনোভাবের মধ্যে চরম দায়দায়িত্বহীনতার পরিচয় থেকে যায়— একথা বলতে বাধ্য। অবশ্য শুধু মুসলমান সমাজকে দায়ী করা ঠিক নয়, হিন্দু সমাজের একটা অংশ অভাব অশিক্ষা অজ্ঞতার দরুণ শিশুর জন্মকে ঈশ্বরের দান ভাবে আর চরম অবহেলার পরিচয় দেয় নারী ও শিশুদের প্রতি।

দেশের প্রত্যেকটি শিশু চিকিৎসার সুযোগ পায় না। যেটুকু পায় তার মধ্যেও রয়ে যায় সীমাহীন বঞ্চনা। অনেকেরই অভিজ্ঞতা রয়েছে, একটি অসুস্থ শিশুর চিকিৎসার জন্যে অসহায় বাবা-মাকে চিকিৎসাকর্মীদের কাছে কীরকম কাকুতিমিনতি করতে হয়। টাকা ছাড়া কোনরকম সহায়তা মেলে না। আদর্শবাদী চিকিৎসকরা এখনও আছেন বিভিন্ন আরোগ্য নিকেতনে। তাঁরা বলেন, 'নেই নেই করেও বিভিন্ন হাসপাতালে যা রয়েছে তার মাধ্যমে অনেক কাজ করা যায়। তার জন্যে প্রয়োজন সদিচ্ছা, সহমর্মিতা, সেবার মনোভাব।' ছোটদের চিকিৎসার ব্যাপারটা সহজ করার জন্যে স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি দরকার। সকলের নাগালে ঠিকভাবে পৌঁছোনোর পথ সুগম হওয়া চাই। নানা স্তরের দালাল ধরে এখনও শিশুদের চিকিৎসা করাতে হয়— এটা সমস্যা বৈকি। শিশুদের চিকিৎসার জন্যে যেসব ওষুধ প্রয়োজন তার দাম কম হবে, দেশের সর্বত্র সরবরাহ নিয়মিত হবে— এরকম কঠোর নীতি থাকা দরকার। জানানো দরকার, গ্রামীণ স্বাস্থ্য কেন্দ্র থেকে শহরের সরকারি হাসপাতালে শিশুদের চিকিৎসা অগ্রাধিকার পাবে। প্রতিটি স্কুলে নিয়মিত স্বাস্থ্য পরীক্ষার ব্যবস্থা থাকবে আর তাতে কোনরকম গোঁজামিল বা কারচুপি প্রশ্রয় পাবে না।

শিশুদের শিক্ষা স্বাস্থ্য ইত্যাদি নিয়ে কোনরকম রাজনীতি চলবে না— এমন অঙ্গীকার সব দলের পক্ষ থেকে করা দরকার।

কোন শিশু বড় হয়ে কোন দলের সমর্থক হবে— তার অনুমান না করে শিশু কল্যাণের ক্ষেত্রে সার্বিক উদ্যোগ নেওয়া জরুরি। এরকম ঘোষণা করতে পারবেন কি এদেশের কোনও রাজনৈতিক দলের নেতারা?

নেত্রদান মহাদান

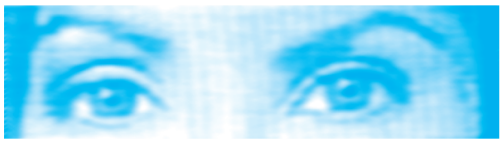

EYE BANK

23580201, 23341628, 23592931
Mobile - 9830333451

অনুসন্ধান ঃ 22181995, 22180387

সৌজন্যে ঃ কলাভারতী

PIONEER®

নিখুঁত লেখার খাতা

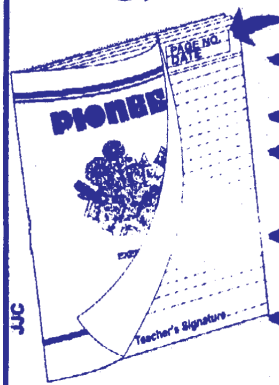

- প্রতি পৃষ্ঠায় PAGE NO. DATE এর ঘর।
- পাইওনিয়ার পূর্ব ভারতের সর্বাধিক বিক্রিত খাতা।
- আদর্শ বাঁধাই ও সুন্দর সাইজ।
- ভাল হাতের লেখার জন্য মসৃণ Creamwove & D.T.P.P. কাগজ ব্যবহার করা হয়।
- প্রতিটি খাতায় সঠিক মার্জিন এবং লাইনিং। সর্বোত্তম গুণমান ও অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরী।
- ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যান্ডার্ড নির্দেশিত IS: 5195-1969 নির্দেশিকা কঠোর ভাবে পালন করার প্রয়াস।
- প্রতি পৃষ্ঠায় Teacher's Signature..... কলাম।

PIONEER PAPER CO.
74, Beliaghata Main Road,
Kolkata - 10, Phone : 2373-0556, 2370-4152
Fax : 2373-2596,
E-mail : pioneer3@vsnl.net

PIONEER®
সঠিক গুণমানই আমাদের পরিচয়

ইমাম চিনি 'ইনাম' দেইখ্যা, বামুন চিনি কেমনে।

শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়,
মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী,
মহাকরণ, কলকাতা,

বড় মুশকিলে পড়েছি। প্রতি সপ্তাহেই ভাবি আর চিঠি লিখে আপনাকে বিরক্ত করব না। কিন্তু আপনি এমন কিছু না কিছু করে দেন যে চিঠি না লিখে পারি না। আসলে আপনি এমন একজন মানুষ যিনি নিজেই বিতর্ক তৈরি করেন। ইস্যুর জন্ম দেন। সেই ইস্যু চাপা দিতে আবার ইস্যু তৈরি করে ফেলেন। বিতর্ক আপনার ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকে। এটাকে যে যতই সমালোচনার চোখে দেখুক আমার কিন্তু বেশ লাগে। খবরের কাগজের যতটা জায়গা জুড়ে আপনি থাকেন তা আর কেউ কোনও কালে পারেনি। সেটা শুধু আপনার পৃষ্ঠপোষক কাগজ নয়, আপনাকে পৃষ্ঠপোষণ করা কাগজেও।

দিদি, সম্প্রতি একটি সমীক্ষায় জানা গেছে একটি সংবাদ চ্যানেলে একজন সংবাদ পাঠক বা পাঠিকাকে একদিনে যতক্ষণ স্ক্রিনে দেখা যায় তার চেয়ে বেশি সময় আপনাকে দেখা যায়। সর্বভারতীয় চ্যানেলগুলোতেও টিকার, ব্রেকিং থেকে হেডলাইনস সবেতেই আপনি সবার ওপরে।

আপনি ধর্মপ্রবর্তকও। আপনি তো বঙ্গবাসীকে দু'টি স্পষ্ট ধর্মে ভাগ করেছেন। একটি ধর্মের নাম রবীন্দ্র-ধর্ম। অপরটি নজরুল-ধর্ম। একথা আমি আগেও লিখেছি। তবু আরও একবার লিখতে মন চাইছে। রবীন্দ্রনাথ বা নজরুল ইসলাম কাউকেই ধর্মের ভাগে ভাগ করা শিখিনি আমরা। আপনি ক্ষমতায় না এলে শেখাও যেত না। কথায় কথায় আপনি বলেন এই বাংলা রবীন্দ্র-নজরুলের বাংলা, এখানে মন্দিরে পুজোও চলবে, মসজিদে আজানও চলবে। আপনি এসব বললেই মনে পড়ে অন্নদাশঙ্করের সেই ভুল কবিতা, 'সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে বিলকুল, শুধু ভাগ হয়নিকো নজরুল।' বড় মিথ্যে, বড় ভুল। বুঝিয়ে দিয়েছেন দিদি আপনি।

আপনার কথায় যখন বাংলার সূর্য ওঠে নামে, মানুষকে ঠিক করতে হয় কোন কাগজ পড়বেন তখন এটাও না হয় ঠিক।

আপনার সেই নজরুল ধর্মের ইমামদের বৈশাখ মাস থেকে ইনাম দেওয়ার কথা ঘোষণা করেছেন তিনি। কিন্তু কেন দিদি? ওঁরা গরিব বলে? কিন্তু যতদূর জানি সাধারণের ছোট ছোট দান নিয়ে চলাই তাঁদের ব্রত। আর এটা যদি ভেবে থাকেন ওঁরা গরিব তা হলেও দিদি একটা প্রশ্ন থেকে যায়। একটু খোঁজ নিয়ে দেখুন প্লিজ। ইমাম মহাশয়দের থেকে অনেক অনেক দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে হয় তাঁদের অগণিত ধর্মভ্রাতাদের। ইমামদের থেকে অর্থ, শিক্ষা, সামাজিক মর্যাদা সব বিচারেই সাধারণ মুসলিমরা অনেক পিছনের সারিতে।

মুসলিম সমাজে ইমামরা ঠিক আপনার বিচারে রবীন্দ্রধর্মের মন্দিরের পুরোহিতের ভূমিকায়। এছাড়াও এই বাংলায় এখনও অনেক পুরোহিত আছেন যাঁরা সমাজের স্বার্থে অত্যন্ত কৃচ্ছ্রসাধন করে জীবন কাটান। বহু মন্দির আগলে রাখেন। তেঁতুল পাতা সিদ্ধ করে খাওয়ার দিন হয়তো নেই কিন্তু তাদের ভরসা বলতে ধর্মভ্রাতাদের দানের ফল, চাল, তেল। চলতি কথায় যাঁর নাম ভুজ্যি। তাঁদের ধুতি, চাদর, গামছাও দান নির্ভর। দিদিমণি, আপনি দয়ার মহাসাগর। শুধু নামে নয়, কাজেও মমতা। দেখবেন নাকি তাঁদের দুঃখ দুর্দশা কীভাবে ঘোচানো যায়? তাঁরাও তো ধর্মনিরপেক্ষ এই দেশে কিছু মাসোহারা ভাতা পেতে পারেন।

আপনি বলবেন কেন? বলবেন, ব্যালেন্স করতে আপনি তো ওই ঘোষণার দিনই বেলুড় মঠে গিয়ে এক কোটি টাকা দেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন বরানগরে রামকৃষ্ণ শিষ্যদের প্রথম মঠবাড়ি সংস্কারের জন্য। কিন্তু দিদি, প্লিজ রামকৃষ্ণ মিশনের সঙ্গে পুরোহিত সমাজের তুলনা করবেন না। তাছাড়া মঠবাড়ি সংরক্ষণের জন্য রাজ্য সরকারের দায়িত্ব থাকতেই পারে কিন্তু কোণঠাসা আর্থিক অবস্থার মধ্যে কোনও সংস্থাকে বাঁচানোর চেয়ে জরুরি সাধারণ মানুষের পাশে দাঁড়ানো। এখনও এই রাজ্য গরিব মানুষের সংখ্যায় দেশের মধ্যে ওপরের সারিতে। শিশু শ্রমিকের সংখ্যায় ওপরের সারিতে। পেটে ভাত না থাকলে ধর্মও যে হয় না দিদি। আর সত্যি বলছি দিদি, রামকৃষ্ণ মিশনকে টাকা দেওয়ার মতো উদার হৃদয় মানুষের সংখ্যাও কম নেই এই সমাজে। এমনকী আগ্রহ দেখালে কর্পোরেট সংস্থারাও এগিয়ে আসবে।

দিদি, আমি জানি আপনি অতশত না ভেবে ইমামদের ভাল চেয়েই এমন অনুদানের ব্যবস্থা করেছেন। তাঁদের শ্রদ্ধা জানাতে চেয়েছেন। কিন্তু দুষ্ট লোকের সংখ্যা তো কম নয়। তারা বলতে শুরু করেছে, আসন্ন পঞ্চায়েত ভোটের দিকে তাকিয়েই আপনি এই ঘোষণা করেছেন। গত বার পঞ্চায়েত ভোটে সংখ্যালঘুপ্রধান জেলা পূর্ব মেদিনীপুর এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা আপনাদের ক্ষমতায় এনে দিয়েছে। এবার টার্গেটের মধ্যে আবার বড় টার্গেট মুর্শিদাবাদ। সেজন্যই নাকি আপনার এই মহানুভবতা। ওরা বলছে, আপনি নাকি নির্বাচনের অনেক আগে থেকেই ভোট কেনা শুরু করে দিলেন। আর আপনার জন্ম-দল কংগ্রেস তো এটাই এতকাল গোটা দেশে করে এসেছেন। তাতে লাভ লোকসান দুই-ই হয়েছে। এখন আপনি লাভের আশাতেই লোকসানের ঝুঁকি নিচ্ছেন। নিন দিদি নিন। কিছু না কিছু জুটবেই। সাচার কমিটির প্রস্তাব সাধারণ মুসলিম ভাইবোনেরা জানেন না। তাঁরা চেনেন পাড়ার ইমামকে। তিনি খুশি হলেই আপনাকে খুশি করার নির্দেশ দিয়ে দেবেন খেতে না পাওয়া ধর্মভ্রাতা, ধর্মভগিনিদের। ইনাম তুষ্ট ইমামরা দু'হাত তুলে বলবেন আপনার জয় হোক দিদি।

শেষ একটা প্রশ্ন করতে ইচ্ছে করছে দিদি। রাগ করবেন না। আসলে একটা হিসেব কিছুতেই মিলছে না। হিসেব বলছে এ রাজ্যে ইমামের সংখ্যা মোটামুটি ৩০ হাজার। তাদের আড়াই হাজার টাকা করে দিতে প্রতি মাসে খরচ সাড়ে সাত কোটি টাকা। সব মিলিয়ে বছরে খরচ ৯০ কোটি টাকা। বাজেটে তো এমন কোনও সংস্থান রাখা নেই। তাহলে অত টাকা আসবে কোথা থেকে? সেটা অবশ্য আপনার চিন্তা নয়। ওটা ভাববেন আপনার ক্লাবের থুড়ি সরকারের কোষাধ্যক্ষ অমিত মিত্র।

বিনীত,

—সুন্দর মৌলিক

চিঠিপত্র

জনদরদী মুখ্যমন্ত্রী

রেল বাজেট যাত্রীভাড়া বৃদ্ধির জন্য মুখ্যমন্ত্রী উষ্মা প্রকাশ করেন। যার ফলে রেলমন্ত্রী দীনেশ ত্রিবেদীকে বরখাস্ত করে মুকুল রায়কে রেলমন্ত্রীপদে বহাল করেন। মুকুলবাবু রেল মন্ত্রকের দায়িত্ব নিয়েই মুখ্যমন্ত্রীর ইচ্ছানুসারেই বর্ধিত যাত্রীভাড়া প্রত্যাহার করে নেন। যাত্রীভাড়া রদ হওয়াতে সবাই খুশি। সাধারণ মানুষ, মা-মাটি-মানুষের সরকারকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করবেন সন্দেহ নেই।

প্রশ্ন একটাই— অতিরিক্ত যাত্রীভাড়া রদ হওয়াতে কারা সবচাইতে বেশি উপকৃত হচ্ছেন? স্লিপার ফার্স্ট, এসি চেয়ার কার, এসি থ্রি-টায়ারে কারা যাতায়াত করেন? সাধারণ যাত্রীরা এইসব ক্লাসে যাতায়াত করেন না বললেই চলে। পয়সাওয়ালারাই ওইসব শ্রেণীতে যাতায়াত করেন।

অপর দিকে নিয়ত বিদ্যুৎ দপ্তর বিদ্যুতের মাশুল বৃদ্ধি করে যাচ্ছেন। এ ব্যাপারে মুখ্যমন্ত্রীর হেলদোল নেই। মুখ্যমন্ত্রীর বক্তব্য পূর্বতন সরকার বিদ্যুৎ মাশুল বৃদ্ধির ব্যবস্থা করে রেখেছেন। ওঁর করার কিছুই নেই।

এ পর্যন্ত তিন দফায়, ৩১ ডিসেম্বর থেকে ১৬ ফেব্রুয়ারি এই দেড় মাসে সরকারি নিয়ন্ত্রণাধীন বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি ২৪ পয়সা বৃদ্ধি করে পকেট কাটার ব্যবস্থা করেছেন। রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন কোম্পানি প্রতি মাসে গড়ে অতিরিক্ত ৬৬ পয়সা আদায় করছেন। যা যোগ করলে প্রকৃত বৃদ্ধি দাঁড়াচ্ছে ১ টাকা ৯২ পয়সা। এই বৃদ্ধি পশ্চিমবঙ্গ ছাড়া ভারতের কোনও রাজ্যে নেই। বর্তমান যুগে ধনী, গরীব সকলেই বিদ্যুৎ ব্যবহার করছেন। বিদ্যুৎ ছাড়া এক পা চলার ক্ষমতা নেই। সেই বিদ্যুৎ নিয়ে ছেলেখেলা কোনওমতেই মেনে নেওয়া যায় না। একদিকে মাশুল বৃদ্ধি, অপরদিকে ঘন ঘন লোডশেডিং।

ভারতের জনসংখ্যা অনুপাতে কতজন রেল ভ্রমণ করেন? কিন্তু ঠেলাচালক, দিনমজুর থেকে শুরু করে সবাই বিদ্যুৎ ব্যবহার করেন। তাই, অনুরোধ করছি বিদ্যুতের সঠিক মূল্য নির্ধারণ করে, ২০০৩ সালের জনস্বার্থ বিরোধী বিদ্যুৎ আইন বাতিল ও মাসে মাসে বিদ্যুতের মূল্য বৃদ্ধির অবাধ ক্ষমতা বিদ্যুৎ দপ্তরকে যে দেওয়া হয়েছে (লাভ হলেও) তা বাতিলের আবেদন রাখছি।

রেল দপ্তর কেন্দ্রীয় সরকারের অধীন, তবুও আপনি যাত্রীভাড়া প্রত্যাহার করে যে নজির সৃষ্টি করেছেন, তেমনি বিদ্যুতের বিষয়ে আপনার আন্তরিক হস্তক্ষেপের জন্য অনুরোধ করছি।

—অনিল চন্দ্র দেবশর্মা, দেবীবাড়ী, কোচবিহার।

'স্বস্তিকা' : কিছু প্রস্তাব

'স্বস্তিকা' পত্রিকার একজন শুভাকাঙ্ক্ষী পাঠক এবং গ্রাহক। বাংলা ভাষায় এরূপ সর্বাঙ্গসুন্দর পত্রিকা আর আছে কিনা আমার জানা নেই। কিন্তু কয়েকটি বিষয়ে আমি আমার ব্যক্তিগত মতামত জানাচ্ছি, আশাকরি বিবেচনা করবেন। (১) পত্রিকাটির ব্যয়ভার লাঘব করার জন্য আরও কিছু রুচিশীল, মার্জিত বিজ্ঞাপন দেওয়ার চিন্তা ভাবনা করা যেতে পারে। এর ফলে পত্রিকাটির আরও উন্নতি এবং শ্রীবৃদ্ধি ঘটবে।

(২) পত্রিকাটি জাতীয়তাবাদী এবং এতে ভারতবর্ষের যে কৃষ্টি, সমাজ, প্রাচীন ইতিহাস, পৌরাণিক, দেশ-বিদেশের সংবাদ ইত্যাদি এক কথায় যা থাকে তা আর কোনও পত্রিকায় পাওয়া অসম্ভব। এই জন্য যদি সম্ভব হয় আরও দেশী-বিদেশী বিভিন্ন তথ্যবহুল সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ঘটনাগুলি পত্রিকায় তুলে ধরা। কারণ প্রকৃত সত্য ঘটনা একমাত্র স্বস্তিকা ছাড়া কোথাও আশা করা যায় না।

(৩) স্বস্তিকা অনেক বাধাবিঘ্ন, ঘাত-প্রতিঘাত পার হয়ে দুর্বার অপ্রতিরোধ্য গতি নিয়ে ক্রমবর্ধমান শশীকলার ন্যায় শ্রীবৃদ্ধি হয়ে নিয়মিত প্রকাশিত হয়ে চলেছে যাতে স্বস্তিকার শুভাকাঙ্ক্ষী পাঠক-পাঠিকা মাত্রই আনন্দিত, উল্লসিত।

এইজন্য আমি আশা রাখছি খুব শীঘ্রই পত্রিকাটি দৈনিক, সম্ভব না হলেও অন্তত সপ্তাহে দুই দিন প্রকাশিত হবে। তারপর সুযোগ সুবিধা নিয়ে দৈনিক রূপে প্রকাশিত হবে।

পূজার ছুটিতে পত্রিকাটি অনেকদিন বন্ধ থাকে। যেখানে এক সপ্তাহ ধরে অধীর আগ্রহ নিয়ে পত্রিকাটির জন্য অপেক্ষা করতে হয় সেখানে এই সুদীর্ঘ সময় অতিবাহিত করা সুকঠিন। এর কি কোনও ব্যবস্থা করা যায় না?

পরিশেষে পত্রিকার সার্বিক মঙ্গল কামনা করে পত্রিকার সামগ্রিক কর্মীবৃন্দ এবং শুভকাঙ্ক্ষীদের অভিনন্দন জানিয়ে লেখা শেষ করলাম।

—সুকমল কুমার, সোনারপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগণা।

'স্বস্তিকা' পরিবারকে ধন্যবাদ

একই দামে আগামী নববর্ষের সংখ্যা থেকে ৩৪ পাতার স্বস্তিকা ৪২ পাতার বেরোচ্ছে। শুনে খুব খুশি হলাম। দেশ ও দশের যা পরিস্থিতি— শান্তির স্বার্থে আমরা আরও কিছু তথ্য খবর ঘটনা উপদেশ ও সমাধান পেতে চাই। অসংখ্য ধন্যবাদ স্বস্তিকা পরিবারকে। আরও বেশি করে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আগামী ১৩ এপ্রিল সন্ধ্যা ৬টায় কেশব ভবনে নববর্ষ সংখ্যার উন্মোচন অনুষ্ঠানে সকলকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্যে। নববর্ষ সংখ্যা হাতে পাওয়ার অপেক্ষায় পথ চেয়ে রইলাম।

—রূপনারায়ণ মাজী, উত্তর রাণীচক, পূর্ব-মেদিনীপুর।

সকল প্রকার স্টীল
ফার্নিচারের জন্য
যোগাযোগ করুন
Dass Steel Co.
Mirchak Road. - Malda
Ph. No. 266063

তবে কি হিন্দু মন্দিরের পুজো-পার্বণ ইমামরাই করবে?

বিপ্লব বসু

হ্যাঁ, মনে হয় ব্যাপারটা তাই করা হলো। গত ৩ এপ্রিল ২০১২ মঙ্গলবার নেতাজী ইন্ডোর স্টেডিয়ামে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী যেভাবে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন মসজিদের ইমামদের জন্য মাসে আড়াই হাজার টাকা করে ভাতা দেবার কথা ঘোষণা করেছেন, তাতে হিন্দুদের মনে এই প্রশ্ন কি উদয় হয় না যে, এবার থেকে হিন্দু মন্দিরের পুজো- পার্বণও কি ওইসব ভাতাপ্রাপক মসজিদের ইমামরাই বিনা দক্ষিণায় করে দেবেন? কারণ ইমামরা হিন্দু মন্দিরের পুজো-পার্বণের দায়িত্ব নিলে কোনও পুরোহিতকে দক্ষিণা দিতে হবে না। পশ্চিমবঙ্গের 'জনপ্রিয় দিদি' কংগ্রেস ও কমিউনিস্ট সরকারের ফেলে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়ে পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু পুরোহিতদের বঞ্চিত করে ইমামদের জন্য মাসিক ভাতার ব্যবস্থা করে দিলেন। ১৯৪৭ সালে তথাকথিত স্বাধীনতার পর থেকে কি কেন্দ্রীয় সরকার, কি রাজ্য সরকার যেভাবে মুসলিম তোষণে নিজের নিজের মন-প্রাণ সঁপে দিয়েছে, তাতে মনে হয় না যে ভারতবর্ষ এক গণতান্ত্রিক দেশ। এখানে সকলের জন্য সমান আইন ও সমান অধিকার থাকবে। কিন্তু তা আজ ধ্বংস হতে বসেছে। "এক নিশান, এক বিধান, এক প্রধান"— এই ছিল ডঃ শ্যামাপ্রসাদের স্বপ্নের ভারতবর্ষ। ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ও নেতাজী সুভাষচন্দ্র বসু যে গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ চেয়েছিলেন, তাকে ধ্বংস করতে কালো চামড়ার সাহেব শাসকরা উঠে পড়ে লেগেছেন। লর্ড মেকলে ও লর্ড মাউন্টব্যাটেনের মানসপুত্ররা যেরূপ নগ্নভাবে মুসলিম তোষণ চালাচ্ছে তাতে মনেই হয় না যে ভারতবর্ষে হিন্দু বলে কোনও সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজ বসবাস করে। হিন্দুরা বরাবর সহনশীল জাতি হিসাবে মর্যাদালাভ করেছে। কিন্তু হিন্দুরা তাদের সঞ্চিত মর্যাদা রাখতে গিয়ে গণতন্ত্র ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে গর্জে উঠতে ভয় পাচ্ছে কেন? আর কত দিন তারা এইসব মুসলিম তোষণকারী সরকারগুলোকে ক্ষমতায় রাখবে? যারা ভারতের গণতন্ত্র তথা ভারতের ঐতিহ্যকে কালিমালিপ্ত করছে তাদের কতদিন সহ্য করবে? ভারতের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ বিভিন্ন সরকারি ট্যাক্স প্রদান করবে আর সেই ট্যাক্সের টাকায় এইসব মুসলিম তোষণকারী সরকারগুলো এক বিশেষ সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সংখ্যালঘুর নাম করে, ধর্মের নাম করে, জাতপাতের নাম করে ও সর্বোপরি ভারতের সাধারণ মানুষকে বোকা বানিয়ে, তাদের মধ্যে ভাগ-বাঁটোয়ারা করে দেবে। একদল মানুষ সর্বপ্রকার সুখ-সুবিধা ভোগ করবে আর একদল মানুষ সবদিক দিয়ে বঞ্চিত হবে। এ কিসের গণতন্ত্র? আজ বিজ্ঞানের যুগে শুধুমাত্র ভোটে জয়লাভের জন্য মনুষ্যত্ব বিসর্জন দিয়ে ইংরাজ সরকারের মতো দেশের তথাকথিত নেতৃবৃন্দ নির্লজ্জ মুসলিম তোষণ করে চলেছেন ও ভারতের গণতন্ত্রকে ধ্বংস করেছেন। হিন্দুরা আর কতদিন এইসব অপমান সহ্য করবে? সুভাষচন্দ্র বসুর মতো এই কালো চামড়ার সাহেবদের বিরুদ্ধে আমাদের গর্জে উঠবার সময় হয়েছে। কারণ ১৯৪৭ সালে আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করিনি এবং আজও আমরা প্রকৃত অর্থে স্বাধীন নই। আমাদের দারিদ্র্য, অজ্ঞতা, ধর্মভীরুতা প্রভৃতির সুযোগ নিয়ে একদল গণতন্ত্র ধ্বংসকারী নেতৃবৃন্দ ভারতের মাটিকে অপবিত্র করছে। আজ সময় এসেছে ওইসব কালো চামড়ার সাহেব-সাহেবাদের ক্ষমতার অলিন্দ থেকে হটিয়ে দিয়ে বঙ্গোপসাগরের জলে নিক্ষেপ করার। তবেই আমরা প্রকৃত স্বাধীনতা অর্জন করবো। ভারতবর্ষ প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ করবে।

বেঙ্গল সামুই ফ্যাক্টরী
নিউ কমল ব্রাণ্ডের ভাজা সামুই ব্যবহার ক(ন
মাত্র দুই মিনিটে (ীর তৈরী হয়।
শান্তিনিকেতন, বোলপুর
ফোন - (০৩৪৬৩) ৫৬২২২

পৌরাণিক নগর

পৌরাণিক নগর মদ্রের অবস্থান অধুনা পাঞ্জাব অঞ্চল

পৌরাণিক নগর

মদ্র

গোপাল চক্রবর্তী

মদ্র দেশটির অবস্থান ছিল অবিভক্ত পাঞ্জাব অঞ্চলে। রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণে মদ্রের বহুল উল্লেখ আছে। পাণ্ডুর দ্বিতীয়া পত্নী মাদ্রী ছিলেন মদ্রের রাজকন্যা। কুরুক্ষেত্র যুদ্ধেও মদ্ররা অংশ গ্রহণ করেছিল। মদ্ররা কয়েকটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। যেমন উত্তর মদ্রগোষ্ঠী, দক্ষিণমদ্র গোষ্ঠী বা আদি মদ্রগোষ্ঠী, পূর্ব মদ্রগোষ্ঠী। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ মদ্রদের সম্বন্ধে বলেছে যে হিমবত পর্বতের ধারে উত্তর কুরুদের পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে তারা বাস করত। Zimmer এবং Macdonell মনে করেন সম্ভবত এই অঞ্চল ছিল কাশ্মীর। পূর্ব মদ্রগোষ্ঠী সম্ভবত বর্তমান পাকিস্তানের পশ্চিম পাঞ্জাব জেলার শিয়ালকোটের নিকটবর্তী কোন অঞ্চলের অধিবাসী ছিল। এই অঞ্চল ত্রিগর্ত বা কাঙরা থেকে বেশি দূরে ছিল না।

দক্ষিণ মদ্রেরা পাঞ্জাবের ইরাবতী বা রারি নদীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত মধ্য পাঞ্জাব অঞ্চলে বাস করত। পঞ্চদশ শতাব্দীতে গুরুগোবিন্দের সময় অমৃতসর মদ্রদেশের অন্তর্ভুক্ত হয়। প্রাচীন রাজধানী ছিল (সম্ভবত পুট-ভেদন) শাকল বা সাগল-নগর (বর্তমান শিয়ালকোট)। এই নগরের কথা মহাভারত এবং অনেক জাতকে উল্লেখ করা হয়েছে। 'শাকল্য' নামে এক বৈদিকগুরু যিনি জনকের রাজসভায় ছিলেন সূত্রের ইঙ্গিত করে। আগপা নদীর কূলে, দুই নদীর মাঝামাঝি এক ভূখণ্ডের ওপর সম্ভবত রেচন দোয়াবের একাংশে এই স্থান অবস্থিত ছিল। এই অঞ্চলকে 'শাকল-দ্বীপ' নামে অভিহিত করা হোত।

পরবর্তী বৈদিক যুগের প্রথম দিকের রচনা থেকে জানা যায় আদি মদ্রদের মধ্যে রাজতন্ত্রের প্রচলন ছিল। জনকের সময় তাদের রাজা কে ছিলেন তথা জানা যায় না। রাজনৈতিক দিক থেকে আদি মদ্রদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু উত্তর মদ্র যেমন বিখ্যাত পণ্ডিতদের আবাস ছিল সেরকম দক্ষিণমদ্র বা আদি মদ্রেও ব্রাহ্মণ্যযুগের অনেক বড় বড় পণ্ডিত থাকতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মদ্রগার শৌঙ্গায়নি এবং কাপ্য পতঞ্জল। যিনি ছিলেন উদ্দালক আরুণির অন্যতম গুরু। মহাকাব্যের গোড়ার দিকে মদ্ররাজ পরিবার মহান সদ্‌গুণ সম্পন্ন পরিবার রূপে পরিচিত ছিল, কিন্তু পরে মদ্রের সুনাম নষ্ট হয় তার অধিবাসীদের অসভ্য আচরণ ও অধার্মিক রীতিনীতির জন্য। ক্রমে ক্রমে মদ্রের অস্তিত্ব বিলীন হয়ে যায়।

রাজনৈতিক দিক থেকে আদি মদ্রদের বিশেষ গুরুত্ব ছিল না। কিন্তু উত্তর মদ্র যেমন বিখ্যাত পণ্ডিতদের আবাস ছিল সেরকম দক্ষিণমদ্র বা আদি মদ্রেও ব্রাহ্মণ্যযুগের অনেক বড় বড় পণ্ডিত থাকতেন। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য মদ্রগার শৌঙ্গায়নি এবং কাপ্য পতঞ্জল। যিনি ছিলেন উদ্দালক আরুণির অন্যতম গুরু।

যোগ চিকিৎসা

যে কোনও শারীরিক-মানসিক রোগ, মেধা স্মৃতি-বুদ্ধি বৃদ্ধি, পড়াশুনায় উন্নতি— বিশিষ্ট যোগ চিকিৎসক-গবেষক অধ্যাপক দীপেন সেনগুপ্তের তত্ত্বাবধানে সম্পূর্ণ ভারতীয় পদ্ধতিতে মাত্র ৭০০ টাকায় ভর্তির দিন থেকে ১ বৎসর যোগ চিকিৎসার ব্যবস্থা করা হয়েছে। চার বৎসর বয়স থেকে সদস্য/সদস্যা নেওয়া হচ্ছে।

স্বামী সন্তদাস ইনস্টিটিউট অব কালচার, যৌগিক কলেজ অ্যাণ্ড নার্সিং হোম,

১০১, সাদার্ন অ্যাভিনিউ, কলকাতা-২৯ ফোন ঃ ২৪৬৪-৬৪৬৪, ২৪৬৩-৭২১৩ যৌগিক নার্সিংহোম (২০টা শয্যা) ঃ ২নং ঘোষপাড়া, নাজিরবাগান, ঢাকুরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৭৮ ফোন ঃ ২৪১৫-৩৫৬৬

লৌকিক দেবতা

ঘাঘর বুড়ি

নবকুমার ভট্টাচার্য

সুপ্রাচীনকালে বঙ্গদেশে এক সময়ের জঙ্গলমহলের অন্তর্ভুক্ত বরাকর আসানসোল অঞ্চলে স্বাভাবিক কারণে গ্রাম্য দেব-দেবীর প্রতিষ্ঠা হয়েছে। আজ ইতিহাসে নামের পরিবর্তন হয়েছে, জীবনধারার পরিবর্তন হয়েছে কিন্তু সাঁওতাল পরগণা সংলগ্ন বাংলার অরণ্যপ্রধান পশ্চিমাঞ্চল আজও বনবাসী সংস্কৃতির উদাহরণস্বরূপ বিরাজ করছে।

'চলন্তিকা' অভিধানে ঘাঘর শব্দের অর্থ ঘুঙুর। 'বঙ্গীয় শব্দকোষ'-এও একই অর্থে ঘাঘর শব্দের ব্যবহারের উল্লেখ রয়েছে। যেমন 'চারি পায়ে বাঁধিল ঘাঘর।' নৃত্যবাদ্যে এবং অতীতে যুদ্ধের অন্যতম সাজঢালের আভরণ হিসেবে ঘুঙুরের ব্যবহার বিশেষভাবে দেখা যায়। রূপরাম চক্রবর্তী তাঁর 'ধর্মমঙ্গল' কাব্যে রাঢ়ের এই অঞ্চলের যুদ্ধের বর্ণনাতে উল্লেখ করেছেন— 'পায়ে বাজে নূপুর, ঘাঘর বাজে ঢালে।' এছাড়াও ঘনরাম চক্রবর্তীও তাঁর ধর্মমঙ্গল কাব্যে রাঢ়ের ঐতিহাসিক চরিত্র ইছাই ঘোষের যুদ্ধযাত্রা প্রসঙ্গে লিখেছেন—

''রণশিঙ্গা কাড়াপড়া টমক টেমাই
শ্যামরূপা পদ ভাবি চলিল ইছাই
ঘাঘর ঘুঙুর ঘণ্টা নূপুরের ধ্বনি
চলিতে চলিতে কানে কত রব শুনি।।'

তবে আঞ্চলিক সামঞ্জস্য বজায় রেখে, পুজোর আচার আচরণ, মন্ত্রের ব্যবহার ও বলিদানের প্রথার মধ্যে ঘাঘর বুড়ি আসলে চণ্ডীরূপেই পুজো পেয়ে আসছেন আজ তিনশো বছর ধরে। কথিত রয়েছে গ্রাম্যদেবী হিসেবে কল্যাণেশ্বরী, নুনিয়াবুড়ি, খুদিয়াবুড়ি, ঘাঘরবুড়ি ইত্যাদি সাতটি দেবীর প্রতিষ্ঠা— এঁরা লৌকিক প্রবাদে সাত বোন হিসেবে পরিচিত। ধুদিয়া, নুনিয়া নামগুলি অবশ্য স্থানীয় নদীর নাম থেকে এসেছে। আসানসোলের উত্তরে নুনিয়া নদীর তীরে উঁচু টিলার উপর প্রতিষ্ঠিত নুনিয়া বুড়ি। আর কাছেই ঘাঘর বুড়ি। তবে এই নাম কি করে হলো তার কোনও ইতিহাস লেখা নেই। তবে যেখানে ঘাঘর বুড়ির পুজোর বেদী তার আশেপাশের জায়গাকে ঘাঘরডাঙা বলত।

এককালে একটি পাথরের ঢিপিই ছিল দেবীর মূর্তি। পরে একটি গাছের গোড়ায় তিনটি পাথরের ঢিবি— সর্বাঙ্গে সিন্দুরচর্চিত হয়ে বিরাজ করছে। দক্ষিণদিকে শিব, বামে দুর্গা এবং মধ্যে ঘাঘর চণ্ডী বিরাজমান। লোকমুখে শোনা যায়, পূর্বে দেবীর বেদী একটি বড় গাছের নিচে ছিল যেটি ১৯৫৬ সালের বন্যায় উপড়ে গিয়ে ভেসে যায়। এখন সেস্থানে একটি ছোট বটগাছ। আগের গাছটির নাম অবশ্য কেউ জানে না। বর্তমানে একটি নাটমন্দির তৈরি করা হয়েছে। প্রত্যহ দেবীর নিত্যপুজো হয় ফুল বেলপাতা বাতাসা ইত্যাদি দিয়ে। মাঝে মাঝে পাঁঠাবলিও পড়ে। তাছাড়া ভক্তেরা ভেড়া। মোরগ, পায়রা মানত করে। মন্দিরের পাশেই বলির জন্য হাড়িকাঠ বসানো। দেবীর মাহাত্ম্য ও প্রতাপ সর্বজনবিদিত। সর্বধর্মের দেবী এই ঘাঘর বুড়ি। এখনও নদীর ওপারের গ্রামে সাঁওতাল সম্প্রদায় পৌষমাসের শেষ পাঁচদিন ধরে ঘাঘর বুড়ির থানে 'বন্দনা' পরব করে। দেবীর পরাক্রম, অলৌকিক কাহিনী বংশপরম্পরায় চলে আসছে।

কোনও এক সময় মাঘ মাসের প্রথম দিন পালকি চড়ে বরকনে যাচ্ছিল ঘাঘর বুড়ির রাস্তা দিয়ে। পাহাড়ী নুনিয়া নদীতে তখন প্রবল স্রোত। অনেক জল, পার হওয়া ছিল অসম্ভব। দলের লোকেরা তখন দেবীর উদ্দেশ্যে পাঁঠা মানত করল। দেবী প্রসন্না হলেন— নদী শান্ত হলো— সবাই নির্বিঘ্নে নদী পার হলো। পার হওয়ার পর কিন্তু দেবীর মাহাত্ম্য অগ্রাহ্য করে সবাই বিদ্রুপ করল দেবীকে। বলল— 'ঢ্যাং ঢ্যাং ঘাঘর বুড়ি। তোর চাই ছাগল মুড়ী'। দেবী রুষ্টা হলেন। সঙ্গে সঙ্গে প্রবল জলস্রোতে বরকনেসহ পালকি ও সহযাত্রীরা সব ডুবে গেল গভীর জলের মধ্যে। পাথরের উপর দুটি লম্বা টান দাগ আজও রয়েছে— লোকে বলে পালকি যে গড়িয়ে পড়েছিল তার দাগ। প্রতি বছর ১ মাঘ ঘাঘর বুড়ির থানে মেলা বসে। নানা অনুষ্ঠান হয়।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের
মুখপত্র
প্রণব
পড়ুন ও পড়ান

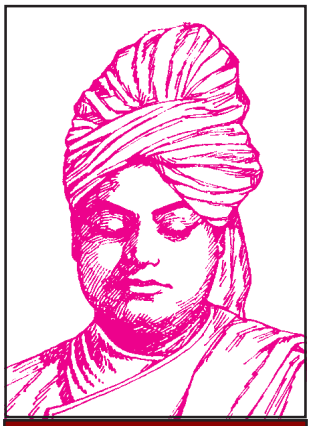

বঙ্গে বিবেক-তীর্থ

আজি শুভদিনে পিতার ভবনে

অর্ণব নাগ

গোটা ভারতবর্ষ ঘোরা বিশ্ববিজয়ী সন্ন্যাসীর সদর্প উক্তি ছিল, 'আমি এই কলকাতারই ছেলে, এখানে পথের ধূলায় খেলা করতাম।' স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম-সার্ধশতবর্ষে তাই তাঁর বাল্যের লীলাভূমি কলকাতা তথা অধুনা পশ্চিমবঙ্গের কোথায় কোথায় এই যুগমানবের পদচিহ্ন পড়েছিল তা নিয়ে স্বস্তিকা-র এক অভিনব তীর্থ পরিক্রমা— বঙ্গে বিবেক-তীর্থ। আজকের তীর্থ স্বামীজী'র জন্মভিটে।

অমৃতসদনে চলো যাই। সেই অমৃতসদন বলাই বাহুল্য উত্তর-কলকেতার বনেদীপাড়া সিমলে অঞ্চলের ৩নং গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিটের বড়লোকি দত্তবাড়ি। দক্ষিণেশ্বর থেকে ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব দেখেছিলেন এক দিগন্তব্যাপী আলোকবৃত্ত। সিমলে অঞ্চলের ঠিক মাথার ওপর। নামতে নামতে কোথায় যেন মিলিয়ে যাচ্ছে। সব সংশয়ের নিরসন হলো ১৮৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি। স্বামীজী'র জীবনচরিতকার সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদারের অসামান্য লেখনী— ''কুজ্ঝটিকাবৃত হিমমলিন পৌষ সংক্রান্তির পুণ্যপ্রভাতে দলে দলে নরনারী ত্রস্তপদে, স্পন্দিত দেহে মকরসপ্তমী স্নানের জন্য ভাগীরথী অভিমুখে ধাবিত। এমন সময় সূর্যোদয়ের ৬ মিনিট পূর্বে, ৬টা ৩৩ মিনিট ৩৩ সেকেন্ডে দেবী ভুবনেশ্বরী বিশ্ববিজয়ী পুত্র প্রসব করিলেন। পুলকোচ্ছল হর্ষকোলাহলে দত্তগৃহ মুখরিত হইয়া উঠিল। পুরনারীরা মঙ্গলশঙ্খ বাজাইয়া হুলুধ্বনি দিতে লাগিলেন। বঙ্গের ঘরে ঘরে পৌষ-পার্বণের আনন্দোৎসব। যেন নবজাত শিশুকে সাদর অভ্যর্থনা করিবার জন্য লক্ষ লক্ষ বালক-বালিকার হর্ষবহুল কলরবে দীনা বঙ্গজননীর প্রতি গৃহপ্রাঙ্গণ মুখরিত হইয়া উঠিল।''

এঁরা হলেন দক্ষিণরাঢ়ী কাশ্যপ গোত্রের দত্ত। আদি নিবাস বর্ধমান জেলার কালনা মহকুমার অন্তর্গত দত্ত-দরিয়াটনা (চলতি ভাষায় দেরেটোন) গ্রাম। এককালে বিশেষ করে বৃটিশ-কলকাতার আঠেরো-উনিশ শতকে দক্ষিণ-রাঢ়ী কায়স্থ এবং এই জাতিভুক্ত দত্তরা বেশ জাঁকিয়ে বসেছিলেন। বিবেকানন্দের পরিবারও তার ব্যতিক্রম নয়। পারিবারিক প্রবাদের উল্লেখ করে স্বামী বিবেকানন্দের অনুজ মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন এই দত্ত-বংশ আদিতে 'আমলাহাড়া' নামক কোনও স্থানে বাস করতেন। এই বংশের রামনিধি দত্ত পুত্র রামজীবন ও পৌত্র রামসুন্দরকে নিয়ে দরিয়াটনা থেকে কলকাতায় চলে আসেন এবং গড়-গোবিন্দপুরে বসতি স্থাপন করেন। পরে ফোর্ট উইলিয়াম দুর্গ নির্মাণের সময় ওখান থেকে অধিবাসীরা বাস্তুচ্যুত হন এবং রামনিধি ও রামজীবন সিমুলিয়াপল্লীর মধু রায় লেনে উঠে আসেন। পরে ৩নং গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিটে দেরোটোনের এই দত্তবংশের স্থায়ী বসতবাটী নির্মিত হয়। যে বাড়িতে নরেন্দ্রনাথ, উত্তরকালের বিশ্ববিশ্রুত সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দের জন্ম।

এই বাড়িটির একটি অনবদ্য বর্ণনা পাই বিবেকানন্দ অনুজ মহেন্দ্রনাথের লেখায়। তাঁর বিবরণ--- ''গৌরমোহন মুখার্জি স্ট্রিটের বাড়ি খুব প্রশস্ত ছিল। বাড়ির অভ্যন্তর দেড় বিঘা ছিল এবং আশেপাশে অনেক জমিতে রেওয়াত ছিল। বাড়ির বর্ণনা বলিতে হইলে প্রথম ঠাকুরদালান হইতে আরম্ভ করিতে হয়। পাঁচফুকুরী ঠাকুরদালান পশ্চিমমুখী অর্থাৎ ইহার পাঁচটি খিলান ও ঘষা গোল ইঁটের থাম। ঠাকুরদালানের সম্মুখে বড় প্রাঙ্গণ। ঠাকুরদালানের উপরের দক্ষিণদিকে দুইতলা বড় বড় হলঘর। উত্তরদিকের ঘরটিকে 'বড় বৈঠকখানা ঘর' বলা হইত। দক্ষিণদিকের নীচের ঘরটিকে 'বোধন ঘর' বলা হইত এবং উপরকার ঘরটিকে 'ঠাকুর ঘর' বলা হইত। তাহার পর বাহিরের উঠানে চকমিলানো দালান ও ঘর। অন্দরমহলে দুইদিকে দু'টি উঠান ছিল এবং পিছনদিকে কানাচ বা পুকুর ছিল।''

এই বাড়ির আরও একজন মানুষ সন্ন্যাসী হয়ে গিয়েছিলেন। তিনি হলেন স্বামীজী'র ঠাকুর্দা ও বিশ্বনাথ দত্তের বাবা দুর্গাপ্রসাদ দত্ত। তখনকার দিনের প্রথা অনুযায়ী বাড়ির ছাদে অস্থায়ী আঁতুড়ঘর নির্মাণ করে নরেন্দ্রনাথের জন্ম হয়েছিল। জন্মলগ্নে সূতিকাগৃহে উপস্থিত ছিলেন বিশ্বনাথ দত্তের এক পিসি। নবজাত শিশুটিকে দেখে তিনি বলে উঠেছিলেন, 'এ যে ঠিক সেই দুর্গাপ্রসাদ। মায়া কাটাতে পারেনি তাই আবার নাতি হয়ে জন্মেছে।' ৬-৭ মাসের শিশুপুত্র বিশ্বনাথকে রেখে দুর্গাপ্রসাদ গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। প্রব্রজ্যার ১২-১৪ বছর পর তিনি কলকাতায় ফিরলে তাঁকে দত্তবাড়ির দক্ষিণদিকের বোধনঘরে বন্দী করে রাখা হয়। কিন্তু ওই অবস্থাতে তিনদিন খাবার দূরে থাক, বিন্দুমাত্র জলস্পর্শ না করে অনবরত জপ করতে থাকায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে বাড়ির লোকেরা ভীত হয়ে তাঁকে ছেড়ে দেন। পরবর্তীকালে সন্ন্যাসী বিবেকানন্দের জীবনেও সন্ন্যাসব্রতের এই কঠোরতা পরিলক্ষিত হয়েছিল। স্বামীজী'র ছোটভাই ভূপেন্দ্রনাথ দত্ত বিস্ময়কর তথ্য দিয়েছেন— সন্ন্যাস গ্রহণের পরে এবং আমেরিকায় বিশ্বজয় করে প্রত্যাবর্তনের আগে গেরুয়া বস্ত্রে বিবেকানন্দকে দেখা যায়নি ৩ গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিটের দত্তবাড়িতে। তাঁর মেজভাই মহেন্দ্রনাথের তথ্য ততোধিক বিস্ময়কর— রামকৃষ্ণদেব কখনও দত্তবাড়ির অন্দরে প্রবেশ করেননি। দ্বারপ্রান্তেই প্রয়োজনীয় কাজটুকু সেরে বিদায় নিয়েছেন। এবাড়ি জুড়ে স্বামীজী'র কতোই না স্মৃতি। দুরন্ত বালক বিলেকে মা ভুবনেশ্বরীর মাথায় জল ঢেলে 'শিব শিব শিব' বলে মাথা থাবড়ে শান্ত করা, জাত যাচ্ছে কিনা পরীক্ষা করার জন্য বীরেশ্বরের বাবা বিশ্বনাথ দত্তের নানা জাতের লোকের হুঁকো টেনে দেখা, বাড়ির সহিস-কোচওয়ানদের সঙ্গে নরেন্দ্রনাথের জমিয়ে গল্প করা, চিলেকোঠার ঘরে সাপ আসা, সেখানে প্রথমে রাম-সীতার মূর্তি, পরে শিব পুজো করা— ৩নং গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিট এভাবেই ধন্য হয়ে রয়েছে বালক-কিশোর বিবেকানন্দের স্মৃতিতে। যৌবনের সন্ন্যাসী বিবেকানন্দ কীভাবে সেই ভিটেবাড়িতে মায়ের অধিকার রক্ষায় আইন-আদালতে জর্জরিত হয়েছে তারও সাক্ষী ৩নং গৌরমোহন মুখার্জী স্ট্রিট, একবিংশ শতাব্দী-র সর্বশ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্রটি।

নবাঙ্কুর

বড়োদের পরামর্শ

‘উৎসাহ পেলে ছোটোরা সব কাজ করবে মজায় আনন্দে’

বললেন দিলীপকুমার সিংহ

এম এস সি পাশ করার পরই একটা কলেজে অঙ্ক পড়িয়েছেন। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র কলেজ। কয়েকমাস সেখানে থাকার পর চলে গেছেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে গণিতের শিক্ষক হিসেবে। বিজ্ঞানচর্চার সঙ্গে জড়িয়ে আছে গণিত। আধুনিক গণিতচর্চা সম্পর্কে দেশে বিদেশে অনেক কথা বলেছেন দিলীপকুমার সিংহ। তবে স্বীকার করেছেন, ‘ছোটোদের শেখানোর অভিজ্ঞতা বা ক্ষমতা আমার নেই। যাঁরা শেখান তাঁদের বলি যত্নে শেখাবেন। ভালোবেসে শেখাবেন। প্রত্যেকের দিকে লক্ষ্য রেখে।’

গণিত শেখানো যাতে উন্নতমানের ও আধুনিক হয় সেজন্যে যেসব ভাবনাচিন্তা চলছে তাতে চল্লিশ বছর ধরে সক্রিয় ভূমিকা তাঁর। এ আই এম টি সংস্থার পুরো নাম ‘অ্যাসোসিয়েশন ফর ইমপ্রুভমেন্ট অফ ম্যাথমেটিকস টিচিং’। গণিত ভীতি নয়, গণিত প্রীতি জাগানোর কাজ করছে এ আই এম টি। ছোটোদের তিনি পরামর্শ দেন সবসময়— ‘খাবে খেলবে পড়বে। সবটাই মজায় আনন্দে করা দরকার।’

‘স্কুলে কতকিছু শিখছে ছোটোরা। ওই সময়ে চারপাশে তাকিয়ে দেখার অভ্যেস দরকার। প্রতিদিন স্কুলে আসা আর বাড়ি ফেরার পথে অনেক জিনিস দেখতে পায় ছোটোরা। পরিবেশ চেনা গাছ চেনা পশু পাখি দেখা তার মধ্যে থাকে। আশপাশে নোংরা জমে আছে দেখে ছোটোরা এগিয়ে গিয়ে বলতে পারে এমন কাউকে যিনি তাদের কথা মন দিয়ে শুনবেন।’

দিলীপকুমার সিংহ
বিশ্বভারতীর প্রাক্তন উপাচার্য।

‘যেখান সেখান দিয়ে রাস্তা পার হচ্ছে লোকজন। অনেকরকম অসুবিধে দেখা দিচ্ছে। পুলিসের লোকজন অনেক বলে বলেও অভ্যেস বদলাতে পারেনি। স্কুলের ছেলেমেয়েরা একটু তালিম নিল কীভাবে যানবাহন আর মানুষকে ঠিকভাবে চলার জন্যে বলতে হবে। দেখা গেলো ছোটোদের কথা সকলে শুনছে, মানছে। তারা উৎসাহে কাজ করেছে।’

‘এভাবে ছোটোদের অনেক কিছু শেখানো যায় পড়াশোনার সঙ্গে। একটু উৎসাহ জাগাতে পারলে বহু কাজ করা সহজ হবে। ছোটোরা আমাদের দেখিয়ে দেবে, এগিয়ে দেবে। ছোটোদের জন্যে আমার শুভেচ্ছা সবসময় রয়েছে।’ *সাক্ষাৎকার : **কৌশিক গুহ***

অন্য বার্তা

কাভালিন

কৈশোরেই বিস্ময় জাগালো তার প্রতিভায়

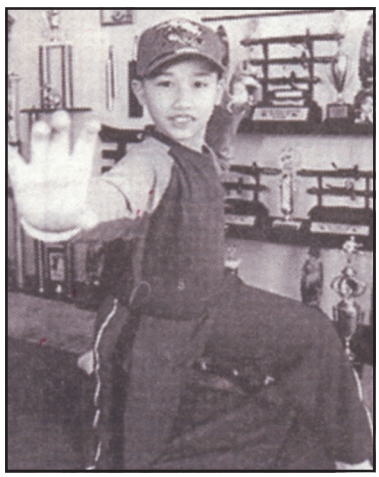

আট বছর বয়সে স্কুলের পড়া শেষ করে কলেজে নাম লিখিয়েছিল মোশে কাই কাভালিন। ইস্ট লস অ্যাঞ্জেলস সিটি কলেজ থেকে ন’ বছর বয়সে প্রথম অ্যাসোসিয়েট অফ আর্টস ডিগ্রি পায়। বয়স এখন ১৪। এর মধ্যে মিলছে দ্বিতীয় স্নাতক ডিগ্রি। সেই সঙ্গে লিখে ফেলেছে একটা বই। তাতে কি আছে? কীভাবে অত কমবয়সে ওইরকম সাফল্য সে পেলো সেসব কথাই লিখেছে। ১০০ পাতার বই। নাম ‘উই ক্যান ডু’। নিজের কথা বললেও বইটা হলো সকলকে প্রেরণা দেওয়ার। কাভালিন সবসময় একটা কথা মেনেছে ‘লক্ষ্যে অবিচল থাকো, কাজের প্রতি নিষ্ঠা রাখো। আসবে সাফল্য। আসবেই।’ এই সহজ কথাটা সকলের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চায় কিশোর কাভালিন। ভালোবাসে ফুটবল খেলা আর মার্শাল আর্ট। পড়াশোনায় যেমন ভালো তেমনি অন্যদিকে মন দিয়েছে। পুরস্কারও পেয়েছে। অনেকে তাকে ‘জিনিয়াস’ বললেও সে মানতে রাজি নয়। সে বলেছে, কঠিন পরিশ্রমই সব। কোনও কাজই উদাসীনভাবে করা ঠিক নয়।’

তার কাছে আচার্য-বন্ধু-দিশারী হয়েছিলেন ইস্ট ‘লস অ্যাঞ্জেলস সিটি কলেজের অধ্যক্ষ রিচার্ড অ্যাভিলাস। ‘উই ক্যান ডু’ বইটি লিখতে চার বছর সময় লেগেছে। কাভালিনের মা চীনদেশীয়। বইটি প্রকাশের পর অন্যরকম সাড়া ফেলে মালয়েশিয়া সিঙ্গাপুর তাইওয়ানে। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়াতেও বিক্রি হচ্ছে গরম রুটির মতো। —*বার্তাবহ*

দেবাদৃতার বই

দেবাদৃতার বয়স এই এপ্রিল মাসে সাতবছর হলো। বাড়িতে জন্মদিনের অনুষ্ঠান হয়। প্রতিবারই আগের দিন মা একটা জামা কিনে আনে। পিসেমশাই কেকের অর্ডার দেয় পাড়ার দোকানে। দেবাদৃতার বাবা খুব ভালো কেক তৈরি করতে পারে। পিসি সকালে পায়েস রাঁধে। ঠাকুমা যখন ছিল নাতনির জন্মদিনে অনেক কিছু করত। একটা বই দিত। দাদাই, মানে দাদুও বই দেয় এখন। জন্মদিনে মা একটুও বকেনা। শুধু বলে, ‘বেশি আইসক্রিম খেয়ো না কিন্তু।’ আইসক্রিম খুব ভালো লাগে যে! তিন চারটে খাওয়া হয়ে যায়। ওর দাদা সপ্তর্ষি বোনের জন্যে পাড়ার বইয়ের দোকান থেকে একটা বই কিনে আনে। পিসতুতো দাদা পল্লবকে ডাকে দাদাভাই। পল্লব অনেকটা বড়ো বোনের থেকে। আগে জন্মদিনে বোনের জন্যে খেলনা কিনত। এখন কেনে বই। ঠাকুমা বলত, ‘বইও তো খেলনা। দু’চারটে ছিঁড়বে। ছবি দেখবে প্রথমে। তারপর পড়তে শিখবে। পড়ার মজা পেয়ে যাবে।’ ‘দেবাদৃতা’ নামটাও দিয়েছিল ঠাকুমা। তার অনেক খেলনা যেমন আছে, তেমনি বই। পুরনো বেশ কিছু খেলনা মা দিয়েছে পাড়ার গরিব ছেলেমেয়েকে। সব বই যত্নে রয়েছে। বাড়িতে একটা আলমারি আছে, দুই ভাই বোনের। দাদা বড়ো, তাই তার তাক চারটে। দেবাদৃতার তাক তিনটে। বইয়ের তাক দিনে দিনে ভরে উঠছে। খুব যত্নে রাখে বইগুলো।

—**বইমিত্র**

প্রশ্নবাণ

১. বিশ্ব অরণ্য দিবস কত তারিখে পালিত হয়?

২. রবীন্দ্রনাথের ‘রাখী সংগীত’ নামে গানের প্রথম চরণটি কি?

৩. টপ্পা জগতের নিধুবাবুর প্রকৃত নাম কি?

৪. চৈতন্যমহাপ্রভুর আসল নাম?

৫. কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের প্রথম বাঙালি অধ্যাপক কে?

উত্তর : ১. ২১ মার্চ, ২. বাংলার মাটি বাংলার জল, ৩. রামনিধি গুপ্ত, ৪. বিশ্বম্ভর মিশ্র, ৫. প্যারীচরণ সরকার।

ছোটোদের লেখা

পুষি

নবরূপা ভট্টাচার্য

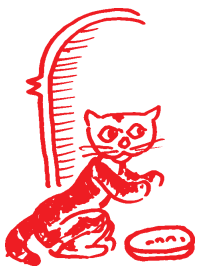

আমার ছিল একটি পুষি,
নাম তার ছিল— টুসি।
মাছ দেখে তার খুব বায়না,
মাছ ছাড়া সে ভাত খায়না।
মাছ ছিল না সেদিন ঘরে,
পুষি তো তাই কেঁদেই মরে।

অষ্টম শ্রেণি।
শ্রীরামপুর উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়,

উলটো পালটা

ক’দিন আগে স্কাউটিং ক্লাসে শুভদীপ শিখেছে ‘রোজ একটা কোনও ভালো কাজ করার কথা ভাববে।’

সেদিন স্কুলে স্কাউটিং ক্লাসে অমিতস্যার জিজ্ঞেস করলেন, ‘আজ কে কে কোন ভালো কাজ করেছো?’

হাত তুলল শুভদীপ। স্যার বললেন, ‘বলো কি ভালো কাজ করেছো।’

শুভদীপ বলল, ‘আমাদের পাড়ার এক কাকু যেভাবে হাঁটছিলেন তাতে মনে হলো স্টেশনে পোঁছে ট্রেনে উঠে ওঁর অফিস পোঁছোতে নির্ঘাত দেরি হয়ে যাবে। আমি ভাবলাম ওঁর উপকার করা দরকার। আমাদের কুকুরটাকে ছেড়ে দিলাম। সেই কাকু এমন দৌড়োলেন যাতে স্টেশনে পৌঁছোতে দেরি হলো না।’

।।২।।

তুহিন মাঝে মাঝেই বায়না করে ‘এটা কিনে দাও, ওটা কিনে দাও’।

একদিন বাজারে গিয়েছিল বাবার সঙ্গে। অনেকক্ষণ চুপচাপ থাকার পর বলল ‘বাবা, প্লিজ আমাকে ওই বাজনাটা কিনে দাও।’

বাবা বলল, ‘না না। তুমি বাজনা বাজাতে বাজাতে আমার মাথা খারাপ করে দেবে।’

তুহিন বলল, ‘না বাবা, আমি প্রমিস করছি, তুমি শোবার পর আমি ওটা বাজাবো।’

-রামগরুড় সংকলিত

ব্যক্তিগত নয়, চাই পারিবারিক ক্ষমতায়ন

মিতা রায়

দু' শতাব্দী ধরে 'ক্ষমতায়ন' শব্দটি খুবই প্রচলিত; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে এই শব্দটির সঠিক অর্থ পুরুষ বা মহিলা কেউই জানেন না। ক্ষমতার অধিকারী কোনও এক ব্যক্তি বলতে তাকেই বোঝায়, যার সবরকম বিষয়ে অর্থাৎ শিক্ষা, রাজনীতি, আর্থিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে স্বাধীনভাবে সব কিছু উপভোগ করার অধিকার আছে। একবিংশ শতাব্দীতে রাজ্য- রাজনীতির ক্ষেত্রেও আজ অধিকার অর্জনের কথা উল্লিখিত ও আলোচিত। স্বাধীনতার পর থেকে সরকারের পক্ষে সমাজের অনুন্নত শ্রেণীর উন্নতি ক্রমশ গ্রহণ করা হয়েছে। সর্বস্তরে কল্যাণ ও উন্নতির জায়গায় 'ক্ষমতায়ন' কথাটি ব্যবহৃত হচ্ছে। ২০০১-এ বিজেপি সরকারে অটলবিহারী বাজপেয়ী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন নারী, শিশু ও বয়স্কদের অধিকারের কথা বলেছিলেন। এমনকী 'নারীর ক্ষমতায়ন ধর্ম' হিসেবে পালন করা হয়েছে। এদের প্রতি গুরুত্ব দেওয়ার একমাত্র কারণ এই যে একজন নারী, সে শিশু, মেয়ে ও বয়স্কারা একই পরিবারের অন্তর্ভুক্ত হিসেবে পরিগণিত হয়। বর্তমানে যে সময় এসেছে, তাতে মনে হয় সমাজ ও সরকারের উচিত পরিবারগুলির প্রতি নজর দেওয়া এবং তাদের উন্নতির অগ্রগতি করা। কারণ পরিবার হলো সমাজের প্রথম ধাপ। পরিবারই হলো একটি শিশুর চরিত্রগঠনের প্রাথমিক স্তর। আমাদের ভারতীয় সমাজে পরিবার মানেই পরিবারের সদস্যদের পারস্পরিক নির্ভরতার স্থান। প্রত্যেকের জন্য প্রত্যেকেরই দায়িত্ব ও কর্তব্য বর্তায়। ওই সময় প্রধানমন্ত্রী এবং মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী মুরলীমোহন যোশী এই ব্যাপারটাকে গুরুত্ব দিয়ে এই প্রকল্পকে সম্মান জানিয়েছেন। অনেক প্রয়োজনীয় সিদ্ধান্তও গ্রহণ করা হয়েছে। যেমন— মহিলা নীতি, মহিলা বাজেট। এমনকী অঙ্গনওয়াড়ি কর্মীদের ভাতা বৃদ্ধি করে বেতন ২০০ থেকে ১০০০ পর্যন্ত ধার্য হয়েছে। এই বছর সরকার এবং বিভিন্ন মানবকল্যাণকর সংগঠনগুলি খুবই গুরুত্বের সঙ্গে চিন্তাভাবনা করেছে এবং কাজ করতে চেষ্টা করেছে। পরিবারের পুরুষ সদস্যরা পরিবারগুলিতে মহিলাদের ক্ষমতায়ন সম্পর্কে চিন্তাভাবনা করেছেন। এটা ভাবতে ভাল লাগে যে

মহিলাদের ক্ষমতায়ন ব্যাপারে পুরুষদের মুখে হাসি ফুটেছে। তাঁরা খুশি। এ যুগে পুরুষদের পক্ষ থেকে মহিলাদের এই সম্মান জানানো সত্যিই প্রশংসনীয়। সম্প্রতি বেশ কিছু বিধিবদ্ধ আইনও নির্দিষ্ট করা হয়েছে পরিবারের শিশু, মহিলা ও বয়স্কাদের জন্য। কারণ, একই পরিবার থেকেই তাঁরা উঠে আসেন। সুতরাং এমন একটা সময় এসেছে যাতে শুধু মহিলাদের জন্য নয়; পুরো পরিবারকেই অধিকার অর্জনের কথা বলা হচ্ছে। একসময়ে যৌথ পরিবারে একটি শিশুর দেখভাল করার দায়িত্ব শুধু বাবা-মার ওপরই বর্তায় না, সকলেরই অধিকার থাকে তার প্রতি। ছোট শিশুরা পরিবারের অন্য মহিলাদের কাছেও দুগ্ধপান করতে পারে। আগে এভাবেই একটা যৌথ পরিবারে শিশুরা মিলেমিশে বড় হয়ে 'মানুষ' হোত।

বর্তমানকালে সময় এবং পরিস্থিতির বদল ঘটেছে। শহরে এখন যৌথ পরিবারগুলো ভেঙে অণুপরিবার গড়ে উঠছে। সেখানে অন্তত তিনপুরুষ একসঙ্গে থাকতে পারে। কিন্তু এখনকার অণুপরিবারের ছবিটা অন্যরকম— বাড়ির মেয়েরা বাইরের জগতে—কেউ বা চাকুরি, কেউবা মাল কেনাকাটার জন্য বাইরে, ছোটরা স্কুলে কিংবা ক্রেশে— আর বৃদ্ধারা বৃদ্ধাবাসে। কিন্তু বয়োজ্যেষ্ঠরা মনে করেন যে একটা বাড়ি করে তোলা মানে সেই বাড়ির ছাতার তলায় নাতি-নাতনিদের নিয়ে সুখে দিন কাটানো। কিন্তু আজকের ছোট পরিবারে দু' কামরার ফ্ল্যাটে গুরুজনদের থাকবার ঠাঁই নেই। এই ক্ষেত্রে পারিবারিক আবহাওয়া খোলামেলা থাকতে পারে না। একটা শ্বাসরুদ্ধ অবস্থা দাঁড়ায়। ২০০১-এ যখন 'নারীর অধিকার ধর্ম' হিসেবে পালন করা হয়, তখনই শিশু ও বৃদ্ধাদের একই ছাতার তলায় থাকার প্রশ্ন উঠেছে। পারিবারিক অধিকার সমাজ-পরিবারের কিছু সমস্যা আছে তা সরকারের গোচরে আনা প্রয়োজন উল্লিখিত আছে।

বর্তমানে শিশু, মহিলা ও বৃদ্ধারা সম্পূর্ণ পৃথকভাবে গণ্য হয়। তাদের যে কোনও সমস্যায় সমাধান অবশ্যই জরুরি। একই পরিবারের অন্তর্ভুক্তি হিসেবে এদের দেখা উচিত। তাহলেই সমাধানসূত্র মিলবে। পরিবারগুলোতে ক্ষমতায়ন করতে গেলে পরিবারের অন্তর্ভুক্ত শিশু-মহিলা ও প্রবীণাদের স্বাধীন অধিকার দেওয়া প্রয়োজন। আমরা নিজেরাই কিন্তু ধ্বংস করে দিচ্ছি যখন শুধু ব্যক্তিগত অধিকারকে গুরুত্ব দিই। প্রকৃতপক্ষে সমাজে পরিবারগুলোকেই অধিকার দিয়ে গুরুত্ব প্রদান করা দরকার— সেক্ষেত্রে বৃদ্ধাশ্রম, ছোটদের ক্রেশ-এর প্রয়োজনীয়তা থাকে না। একই পরিবারে বৃদ্ধারা আনন্দের সঙ্গেই রক্তের সম্পর্কের নাতি-নাতনি নিয়ে থাকতে পারেন। পরিবারগুলো যদি তাদের সবাইকে নিয়ে থাকার পরিবেশ পায়, তাহলে পৃথক থাকার কোনও প্রশ্ন ওঠে না। ইদানিংকালে সরকার এই ভাবনাচিন্তা করে চলেছে। বিভিন্ন পরিকল্পনা ও কর্মসূচি গ্রহণ করে শীঘ্রই একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যাবে এবং সেটা মহিলাদের ক্ষেত্রে হবে একটা বিরাট প্রাপ্তি।

(অর্গানাইজার পত্রিকায় প্রকাশিত 'নাউ এমপাওয়ারিং দ্য ফ্যামিলি' প্রবন্ধের ভাবানুবাদ)

সন্ত্রস্ত হিন্দুদের আবেদন

আমাদের ভারতে চলে যাওয়ার সুযোগ দিন

ঢাকা থেকে বিশেষ প্রতিনিধি ॥ চট্টগ্রামের হাটহাজারিতে একটি মসজিদের দেওয়াল রাতের অন্ধকারে এক মুসলমান রাজমিস্ত্রী ডেকে এনে ছেনি দিয়ে কেটে মসজিদে হিন্দুদের হামলার গল্প তৈরি করে মসজিদ কমিটির লোকজন, আর এই অজুহাত তুলে নন্দীরহাট ও হাটহাজারি সদরে ১৪টি মন্দির ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। লুটপাট ও হামলার পর অগ্নিসংযোগ করা হয় অন্তত সাতটি হিন্দু বাড়িতে। এই ঘটনার দেড় মাস পর সাতক্ষীরার কালীগঞ্জ উপজেলায় একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে স্বাধীনতা দিবসের অনুষ্ঠানে এক খ্যাতনামা মুসলমান লেখকের (আবুল মনসুর আহমদ) লেখা 'হুজুরে কেবলা' গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে মঞ্চস্থ করা নাটকে হযরত মোহাম্মদকে কটূক্তি করা হয়েছে— এই বায়নার অজুহাত তুলে চট্টগ্রামের একই কায়দায় উপজেলার ফতেপুর ও বসন্তপুর-চাকদহ গ্রামে হিন্দুদের অন্তত ১৫টি বাড়ি লুটপাটের পর আগুন ধরিয়ে দিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়েছে। লুটপাট চালানো হয়েছে আরও ৫/৬টি বাড়িতে। 'হুজুরে কেবলা' গল্পের নাট্যরূপ দিয়েছেন এক মুসলমান নাট্যকর্মী সাহীনুর, ফতেপুরে তার বাড়ী এবং বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির দুই মুসলমান সদস্যের বাড়িও লুটপাটের পর আগুন ধরিয়ে দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে পাড়ার একটি নাট্যমঞ্চ, যেখানে প্রায় প্রতিমাসেই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হোত। ফতেপুর ও বসন্তপুর-চাকদহে মৌলবাদীদের হামলা ও আগুনে গীতা-মহাভারত পুড়েছে, পুড়েছে কোরান শরিফও।

চট্টগ্রাম ও সাতক্ষীরায় পুলিশ ও প্রশাসন হামলার সময় একই রকম ভূমিকা পালন করে। পুরোপুরি নিষ্ক্রিয়ই শুধু ছিল না পুলিশ ও প্রশাসন, কোনও কোনও পুলিশ কমকর্তা ও প্রশাসনের 'লোক' মৌলবাদীদের উস্কেও দিয়েছে। হামলায় সহায়তাও করেছে। রাজনীতিবিদরা সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর কথা বলে মুখে ফেনা তুললেও হামলার সময় সংখ্যালঘু নাগরিকদের আর্তনাদে যখন এক করুণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল, মহিলারা নির্যাতিত হচ্ছিল, শিশুরা ভয়ে-আতংকে কাঁপছিল আর দাউ দাউ করে জ্বলছিল বসতবাড়ি তখন কেউ পাশে গিয়ে দাঁড়াননি। গেছেন অনেক পরে, যখন পোড়া ছাই আর ধোঁয়া ছাড়া আর কিছু ছিল না। গিয়ে যথারীতি অসাম্প্রদায়িকতা ও শান্তির কথা শুনিয়েছেন। সাতক্ষীরায় সংখ্যালঘু নাগরিকদের

আর্তনাদে এবার যুক্ত হয়েছে কয়েকটি মুসলমান পরিবারের সদস্যদের আর্তনাদও। তাঁরাও এবার দেখতে পেয়েছেন ধর্মান্ধ মৌলবাদীদের রূপ। আওয়ামি লিগ ধর্মনিরপেক্ষ দল বলে দাবি (যদিও সম্প্রতি সংবিধানের পঞ্চম সংশোধনীতে এরশাদের ইসলামকে রাষ্ট্র ধর্ম ঘোষণা বহাল রেখেছে) করে, কিন্তু দলের কালীগঞ্জ উপজেলা সভাপতি ও অন্যান্য নেতা বারবার বলেছেন, মহানবীকে অবমাননা করা ঠিক হয়নি। এটা সাধারণ মুসলমানের মনে আঘাত দিয়েছে। যত জোর গলায় এই অভিযোগ করছেন, তত জোর গলায় হামলার প্রতিবাদ করছেন না। অথচ স্থানীয় সাংবাদিকরা জানিয়েছেন, নাটকে রসুলের বিরুদ্ধে কটূক্তি কিংবা অবমাননার কোনও কথা ছিল না।

মঞ্চে অভিনীত সেই নাটকের পাণ্ডুলিপির কপি ও ভিডিও তাদের কাছে আছে। একথা শুনতে চাইছেন না নেতারা। বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কেঁদে ফিরছে। জামায়াতে ইসলামির পত্রিকা 'দৃষ্টিপাত' ওই নাটক নিয়ে মিথ্যা যে রিপোর্ট ছাপিয়ে নারকীয় হামলা উস্কে দিয়েছে সেটাই সত্যি বলে ধরে নিচ্ছেন নেতারা। ২৭ মার্চ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান উপস্থাপন করেছিলেন বিদ্যালয়ের সহকারি প্রধান শিক্ষক মিতারাণী হাজরা, তাঁকে পুলিশ প্রচণ্ড উৎসাহে সঙ্গে সঙ্গে গ্রেপ্তার করে, গ্রেপ্তার করে প্রধানশিক্ষককেও। দুদিন পর মিতারাণীর বাড়ি হামলা চালিয়ে মাটিতে মিশিয়ে দেওয়া হয়।

বসন্তপুর-চাকদহ গ্রাম ফতেপুর থেকে প্রায় দশ কিলোমিটার দূরে। সেখানে হিন্দুপাড়াকে মূল্য দিতে হলো ফতেপুর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের নাটকের জন্যে। তবে সেখানে গিয়ে ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে হামলার শিকার মানুষগুলোর সঙ্গে আলাপ করে প্রকৃত সত্যি কথাটা জানা গেল। বসন্তপুর-চাকদহ গ্রাম থেকে ভারত সীমান্ত মাত্র এক কিলোমিটার। এই বর্ধিষ্ণু হিন্দুপাড়ার বাড়িঘর ও জায়গাজমির ওপর লোলুপ দৃষ্টি পড়েছিল মৌলবাদীদের দীর্ঘ সময় আগে। তখন থেকে হুমকি জায়গাজমি ছেড়ে দিয়ে ভারতে চলে যাওয়ার। 'কিছু মূল্য পাবে, নইলে ফেলে পালিয়ে যেতে হবে।' এই হুমকির মুখে গত এক বছরে এই এলাকার অন্তত ৫০ থেকে ৬০টি পরিবার ভিটেবাড়ি ছেড়ে চলে গেছে ভারতে। সর্বশেষ গত সপ্তাহে গেছে একটি পরিবার। বাকি যারা আছেন তারা রয়েছেন হুমকির মুখে। এবার তাঁদের সামনে অনিশ্চিত ভবিষ্যত। চট্টগ্রাম কিংবা সাতক্ষীরার মানুষ একাত্তরে ঘরবাড়ি হারিয়েছেন, আপনজন হারিয়েছেন। স্বাধীন দেশে আবার নতুন স্বপ্নে নতুন জীবন শুরু করেছেন।

নব্বই ও বিরানব্বই এবং ২০০১ সালে আবার হামলা ও ধ্বংস দেখেছেন। এবার সর্বস্ব হারিয়ে অনিশ্চিত ভবিষ্যতের দিকে তাকিয়ে আছেন। সাংবাদিকদের কাছে মিনতি করছেন, আমাদের সাহায্য দিয়ে কী হবে! সরকারকে বলুন সাহায্য দরকার নেই। আমাদের শুধু ভারতে চলে যাওয়ার সুযোগ দিন। আমরা নতুন জীবন শুরু করতে চাই, তবে এদেশে নয়। সর্বশেষ জানা গেল, সাতক্ষীরায় যাদের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনে মামলা করা হচ্ছে, ক্ষমতাসীন আওয়ামি লীগ নেতারা তাদের বাঁচাতে মরিয়া হয়ে দৌড়ঝাঁপ শুরু করেছেন।

শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভোট

ভারতের বিশ্বাসযোগ্যতাকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করিয়েছে

আতিথি কলম

জি পার্থসারথি

আমেরিকান পৃষ্ঠপোষকতায় তৈরি রাষ্ট্রসঙ্ঘ এল টি টি ই-র সঙ্গে শ্রীলঙ্কা সরকারের দীর্ঘকালীন সংঘর্ষের ফলশ্রুতিতে বহু সাধারণ তামিলের মৃত্যুকে যুদ্ধ অপরাধ হিসেবে চিহ্নিত করে সম্প্রতি এক নিন্দা প্রস্তাব এনেছে। ভারত সরকার সবকিছু তলিয়ে বিবেচনা না করে শরিক ডি এম কে-র চাপে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে।

এখানে বৃহত্তর পটভূমিকায় রাষ্ট্রসঙ্ঘের প্রস্তাবটিকে পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে সরষের মধ্যেই ভূত রয়েছে। একটি আন্তর্জাতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ইরাকে সংঘটিত মার্কিন আক্রমণে নিহতের সংখ্যা ৬ লক্ষ ১ হাজার। উইকিলিকসের সমীক্ষা অনুযায়ী হিসেবটা ৬৬ হাজারের বেশি। মনে রাখতে হবে ইরাকে যুদ্ধ হয়েছিল শুধু সন্দেহের বশে বা কল্পিত অছিলায়। ইরাকের কাছে পারমাণবিক অস্ত্র আছে এমনটা আমেরিকার তরফে রটিয়ে দেওয়া হয়েছিল। বিশ্ববাসীকে সেই মারণ অস্ত্রের কল্পিত আক্রমণ থেকে 'পরিত্রাণ' করতে 'বিশ্বত্রাতা আমেরিকা'র ইরাক অভিযান। আর এর পরে পরেই আমেরিকা ঘোষণা করেছিল এই রকম সব ন্যায়যুদ্ধে বহু নিরস্ত্র নাগরিকের মৃত্যু হওয়াটা খুবই স্বাভাবিক। এটির পোষাকী নাম দেওয়া হয়েছিল 'যৌথ ক্ষতি' (Collateral Damage)। উল্লেখিত সৈন্য সামন্ত ও অসংখ্য নিরীহ নাগরিকের মৃত্যু হওয়ার পরও ইরাকে কিন্তু একটিও পারমাণবিক অস্ত্রের সন্ধান মেলেনি।

ভারতের আগেকার অনেক সরকারই এই পাশ্চাত্য দ্বিচারিতা ধরে ফেলেছিল। তারা কেউই এদের তালে তাল ঠোকেনি। হায় জোট রাজনীতি! ভারতের কাছেপিঠের আর কোনও দেশই এই ছোট্ট গণতন্ত্রপ্রিয়, বন্ধুবৎসল, দ্বীপরাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে আনা দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানায়নি। বাংলাদেশ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। ভারতের পশ্চিম দিকে থাকা মালদ্বীপ, কাতার, সৌদি আরবও শ্রীলঙ্কার পক্ষে দাঁড়িয়েছে!

আবার আফগানিস্তানের দিকে নজর দিলে দেখা পাবে যেখানে আমেরিকান আক্রমণে নিহতের সংখ্যা ৯৪১৫ থেকে ২১,০০৭-এর আশপাশে। এই সংঘর্ষকালীন বা বোমাবর্ষণে মৃত্যুর ঘটনাগুলি ছাড়াও বৃটেন ও আমেরিকান শক্তির হাতে ধরা পড়া অসংখ্য ইরাকি ও আফগানের ওপর নৃশংস অত্যাচার চালানো হয়। এগুলি নথিভুক্ত আছে। আমেরিকান ও ফরাসী বোমার আক্রমণে নিহত অসংখ্য লিবিয়ান নাগরিকের মৃত্যুর সঠিক সংখ্যা এখনও পাওয়া যায়নি।

উপরিউক্ত পরিসংখ্যানগুলি এই জন্য দেওয়া যে আমেরিকার দ্বিচারিতা আজ মাত্রা ছাড়িয়ে গেছে। বার্নাড শ'-এর বিখ্যাত উক্তিটি মনে পড়ে— When a man kills a man it is a murder, when a king kills

someone it is an execution.

মনে রাখতে হবে শ্রীলঙ্কার গৃহযুদ্ধ চলেছিল ৩০ বছর, যার বলি হয়েছিল ৮০ হাজার থেকে ১ লক্ষ লোক। নিহতদের মধ্যে ২৭,৬৩৯ জন এল টি টি ই-র সদস্য, ২৩,৩২৭ জন শ্রীলঙ্কার সৈন্য ও ১১৫৫ জন ভারতীয় সৈন্য। লক্ষণীয়, সংঘর্ষে উভয়পক্ষের নিহতের সংখ্যা প্রায় তুল্যমূল্য। বাকি মৃত্যুগুলি তো আমেরিকান তত্ত্ব অনুযায়ী লক্ষ্য সম্পাদন করতে (শ্রীলঙ্কাকে এল টি টি ই সন্ত্রাসমুক্ত) যৌথক্ষতি (Collateral damage)। তাই আজ শ্রীলঙ্কা হিউম্যান রাইটস বা মানবাধিকার লঙ্ঘন করেছে বা যুদ্ধ অপরাধ সংঘটিত করেছে এমন কথা উঠছে কেন?

এখন যাকে ঘিরে এই যুদ্ধ অপরাধের তত্ত্বটিকে খাড়া করা হচ্ছে সেই এল টি টি ই কম্যান্ডার প্রভাকরণের যুদ্ধ কৌশল একটু দেখা যাক। প্রভাকরণ নিজে ছিলেন একজন দক্ষ সমরবিদ। তিনি শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করতে বরাবর নিরস্ত্র নিরীহ নাগরিকদের সামনে ঠেলে দিয়ে বলয় তৈরি করতেন। সামনে নিরস্ত্র মানুষকে ঠেকনা দিয়ে তিনি আশপাশ দিয়ে পালাবার কৌশল খুঁজে নিতেন। এমনটা ১৯৮৭ ও ১৯৮১ সালে জাফনা ও ভাজুনিয়ায় ভারতীর শান্তি রক্ষী বাহিনীর সঙ্গে সংঘর্ষের সময়ও দেখা গিয়েছিল। এই সময় কৌশলে তিনি বিশেষ পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। এবারেও গৃহযুদ্ধের শেষের দিকে কোণঠাসা হয়ে যাওয়ার পর তিনি যথারীতি আটকে পড়া নিরীহ নাগরিকদের সামনে ঠেলে দিয়ে তাদের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী করে তোলেন। কারণ লঙ্কাবাহিনীর আক্রমণ তখন সর্বব্যাপী।

এখানে এ প্রশ্ন অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক যে প্রভাকরণের নিরীহ মানুষের জীবনকে নিজের রক্ষাকবচ হিসেবে ব্যবহার করাটাই প্রাথমিকভাবে অমানবিক।

আশ্চর্যের কথা, আমেরিকা সংঘর্ষের প্রথমদিকে রসদ ও সামরিক সরবরাহ দিয়ে সরাসরি শ্রীলঙ্কাকে সাহায্য করলেও আজকে হঠাৎ শ্রীমতী ক্লিন্টন ১৮০ ডিগ্রি ঘুরে মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধুয়ো তুলছেন কেন?

তথ্যাভিজ্ঞমহলের সংবাদ অনুযায়ী আমেরিকার স্টেট ডিপার্টমেন্টও এই মানবাধিকার বা যুদ্ধ অপরাধের ব্যাপারটা নিয়ে

প্রভাকরণ নিজে ছিলেন একজন দক্ষ সমরবিদ। তিনি শত্রু আক্রমণ প্রতিহত করতে বরাবর নিরস্ত্র নিরীহ নাগরিকদের সামনে ঠেলে দিয়ে বলয় তৈরি করতেন। সামনে নিরস্ত্র মানুষকে ঠেকনা দিয়ে তিনি আশপাশ দিয়ে পালাবার কৌশল খুঁজে নিতেন।

আদৌ মাথা ঘামায়নি। ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের লবি নিজেদের জাহির করতে ব্যাপারটা বৃটেনকে দিয়ে খুঁচিয়ে তুলেছে। দেনায় জর্জরিত ইউনিয়নের আওতায় থাকা অনেক ছোট ছোট দেশই আজ নৈতিক জ্যাঠামশাইয়ের ভূমিকায় নামছে। এরা অনায়াসে ভুলে যাচ্ছে ইরাক, আফগানিস্থান, লিবিয়ায় কী জঘন্য অপরাধ করেছে।

এটা উপলব্ধি করেই ভারতের আগেকার অনেক সরকারই এই পাশ্চাত্য দ্বিচারিতা ধরে ফেলেছিল। তারা কেউই এদের তালে তাল ঠোকেনি। হায় জোট রাজনীতি! ভারতের কাছেপিঠের আর কোনও দেশই এই ছোট্ট গণতন্ত্রপ্রিয়, বন্ধুবৎসল, দ্বীপরাষ্ট্রটির বিরুদ্ধে আনা দুরভিসন্ধিমূলক প্রস্তাবটিকে সমর্থন জানায়নি।

বাংলাদেশ, চীন, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইনস প্রস্তাবের বিরুদ্ধে ভোট দিয়েছে। ভারতের পশ্চিম দিকে থাকা মালদ্বীপ, কাতার, সৌদি আরবও শ্রীলঙ্কার পক্ষে দাঁড়িয়েছে!

এখানে বলার— ভারতে বিপুল তামিল জনগোষ্ঠীর মতো শ্রীলঙ্কাতেও তামিল বসবাসকারীর সংখ্যা কম নয়। মনমোহন সরকার শ্রীলঙ্কায় গৃহযুদ্ধ বিধ্বস্ত তামিলদের সঠিক পুনর্বাসনের জন্য পর্যাপ্ত সাহায্য পাঠাবার চুক্তি করেছে। মনে রাখা দরকার, তামিল সমস্যার দীর্ঘকালীন সমাধানের লক্ষ্যে শ্রীলঙ্কাও যথাযথ ভূমিকা নিয়ে সেই সাহায্য সঠিকভাবে ব্যবহার করে তামিলদের অবস্থার উন্নতি ঘটাচ্ছে। এই পরিস্থিতিতে আমাদের পারমাণবিক দায়বদ্ধতা বিল নিয়ে টানাপোড়েন, প্রতিরক্ষা দপ্তরের অস্ত্র ক্রয় ও অন্যান্য বিষয়ে বড়দা আমেরিকার মুখ ভারী হলেও তার মন ভাল করতে প্রতিবেশীর স্বার্থকে বলি চড়ানোর আগে অনেক ভাবনা চিন্তার দরকার ছিল।

যাইহোক, এমন জল ঘেঁটে দেওয়ার পর তামিলদের হাতে কিছু কিছু ক্ষমতায়নের যে সদর্থক প্রতিশ্রুতি শ্রীলঙ্কা দিয়েছিল এবং তার প্রয়োগও শুরু করেছিল সেদিকে ভারত সরকারকে নজর দিতে হবে। আমেরিকাকে খুশি করে প্রতিবেশীর বিরাগভাজন হয়ে নিজের দীর্ঘকালীন স্বার্থ বিসর্জন দেওয়া সুবুদ্ধির পরিচয় নয়।

ঝড় বৃষ্টিতে আমচাষে ব্যাপক ক্ষতি মালদায়

তরুণ কুমার পণ্ডিত : মালদা ॥ মালদা জেলার প্রধান অর্থকরী ফল আম এবার ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে ব্যাপক ক্ষতির সম্মুখীন হয়েছে। গত ৬ এপ্রিল শুক্রবার ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে লিচু ও আম চাষের মারাত্মক ক্ষতি হয়ে গিয়েছে। প্রাথমিক ভাবে জানা গেছে জেলার তিন হাজার হেক্টরেরও বেশি আমবাগানের মুকুল ও ফুল সম্পূর্ণ নষ্ট হয়ে গেছে। এতে চাষিদের মাথায় হাত পড়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গ আম উৎপাদনে চতুর্থ স্থানে থাকলেও জেলাগুলির মধ্যে মালদাতেই সব চেয়ে বেশি জমিতে আম চাষ হয়ে থাকে। মালদা জেলাতে প্রায় ২৫ হাজার হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়ে থাকে। গত বছর আমের ফলন কম হলেও তার আগের বছর জেলাতে ১,৫০,০০০ মেট্রিক টন পর্যন্ত আম উৎপাদন হয়েছিল। জেলা উদ্যানপালন দপ্তর সূত্রে জানা গেছে বিধ্বংসী ঝড় ও শিলা বৃষ্টিতে জেলায় আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ৩ কোটি ৯০ লক্ষ টাকা। এ ব্যাপারে একটি রিপোর্ট রাজ্য সরকারের কাছে পাঠানো হয়েছে। এই জেলাতে ফজলি, লক্ষ্মণভোগ, ল্যাংড়া, হিমসাগর, গোলাপভোগ, আশ্বিনা প্রভৃতি আমের পাশাপাশি দেশি প্রজাতির মোহনভোগ, রাখালভোগ, আলতাপেটি, বৌভোলানি, কিষাণভোগ প্রভৃতি প্রায় ২০০ প্রজাতির আম ফলে। আবহাওয়ার তারতম্যের জন্য এবার জেলায় আমের ফলন এমনিতেই কম। তার উপর ঝড় ও শিলাবৃষ্টিতে আমের ফলন ব্যাপক ভাবে মার খেল।

জেলার ১৫টি ব্লকে আমের ক্ষতি হলেও ইংলিশ বাজার, রতুয়া ১,২ ও

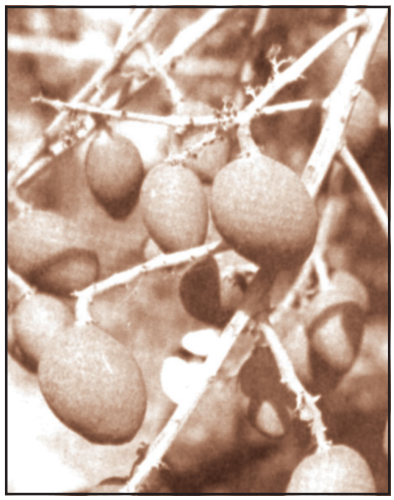

মানিকচক ব্লকে সব চেয়ে বেশি ক্ষতি হয়েছে। ব্যাপক শিলাবৃষ্টিতে শুধু আম ফলের ক্ষতি হয়নি, আমপাতাও ঝড়ে পড়েছে। রতুয়ার পরাণপুর গ্রামের আম চাষী রবীন মণ্ডল, জীবন মণ্ডল, সাধন দাস, ইংলিশবাজার যদুপুর ২নং অঞ্চলের কমলাবাড়ির জয়দেব ঘোষ, কুলেশ রায়দের বক্তব্য, এমনিতেই আমের ফলন কম, তার উপর এই শিলাবৃষ্টিতে সব শেষ হয়ে গেল। এছাড়া লিচু ও গ্রীষ্মকালীন সবজীরও যথেষ্ট ক্ষতি হয়েছে। উদ্যান পালন আধিকারিক তথা উপকৃষি অধিকর্তা (ফল) প্রিয়রঞ্জন পাণিগ্রাহি জানিয়েছেন, এবছর বিদেশে আম রপ্তানির পরিকল্পনা ছিল। বিদেশের বাজারে আলফানসো, ল্যাংড়া, লক্ষ্মণ ভোগ ও আম্রপালী আমের যথেষ্ট চাহিদা রয়েছে। যেহেতু ইউরোপের মানুষ বেশি মিষ্টি আম পছন্দ করেন না, তাই লক্ষণভোগ কম মিষ্টি হওয়ায় এই আমের রপ্তানী এবার বেড়ে যেত। কিন্তু এই প্রাকৃতিক বিপর্যয় সব কিছু নষ্ট করে দিল। উল্লেখ করা যায়, আমকে কেন্দ্র করে তেমন কোনও বড় শিল্প মালদাতে এখনও পর্যন্ত গড়ে উঠেনি। অথচ ঝড়ের পর প্রচুর আম বাগানে নষ্ট হয়ে যায়। আমের মরশুমে জেলার ৩০—৪০ শতাংশ শ্রমিক আম বাগানে বিভিন্ন কাজে লিপ্ত থাকে। ঘরে আমসত্ত্ব ও আচার তৈরি করেও কিছু মানুষ উপার্জন করে থাকে। কিছু আম কেবল মালদাতেই পাওয়া যায়, যেমন কৃষ্ণভোগ, সীতাভোগ, অমৃতভোগ, ভাদুড়িয়া, রাখাল ভোগ, মিছরিকান্ত প্রভৃতি। মালদা জেলা জুড়ে আম্রপালি আমের বাগান ক্রমশ বাড়ছে। অপর দিকে কিছু কিছু আম বাগান লুকিয়ে কাটা হচ্ছে বাড়ি তৈরি করার জন্য। সরকার থেকে আমচাষীদের এই ব্যাপক ক্ষতিতে কতটা সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়— এখন তাই দেখার।

With Best Compliments :

N. Jivanlal & Co. (Cal) Pvt. Ltd.

1 Mullick Street, Kolkata - 700 007
Phone : 2238-6192, Gram : SUPREME
(Oldest & largest Sheppers of Foodstuffs to Andaman & Nicobar Islands)

EXPRESS TRADING AGENCIES

P-41, PRINCEP STREET (Ground Floor)
KOLKATA - 700 072

সমাজের বিবিধ ক্ষেত্রে স্বয়ংসেবকরা নীরবে কাজ করে চলেছে

রোহিণী প্রসাদ প্রামাণিক

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হিন্দুত্বের বিচারদর্শন নিয়ে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবকরা সমাজের বিবিধক্ষেত্রে কাজ করে চলেছে। বহু বছর ধরে সর্বভারতীয় স্তরে অনেক সংগঠনের মাধ্যমে স্বয়ংসেবকেরা সমাজ জাগরণের কাজে রত আছেন। আমাদের পশ্চিমবাংলাতেও কয়েক বছর আগে থেকে শুরু হয়েছে বিভিন্নমুখী কর্মধারা। এইসব কাজ কোনও প্রভাব বা ছাপ বাংলার সমাজে এখনও পর্যন্ত ফেলতে না পারলেও তাদের কর্মসাধনা ক্রম-অগ্রগতির পথে একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

ভারতীয় কিষাণ-সঙ্ঘ

আজ সরকারি উদ্যোগ ও আর্থিক সহযোগিতা এবং সুস্পষ্ট কৃষি নীতি যদি থাকত তাহলে ভারতের কৃষককুল কোনওদিন বঞ্চিত হতো না, আত্মহত্যাও করতো না। সম্পূর্ণ স্বদেশী চিন্তাধারার প্রয়োগ নিয়ে কৃষি জগতে এক সাফল্য ধীরে ধীরে আসছে কিছু কৃষি অভিজ্ঞ ও কৃষক স্বয়ংসেবক কার্যকর্তার মাধ্যমে। ভারতীয় কিষাণ সঙ্ঘের তত্ত্বাবধানে— স্বয়ংসেবকদের নেতৃত্বে কৃষিজগতে দেশীয় ভাবধারা, প্রয়োগ ও উৎপাদনের মাধ্যমে এক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যাচ্ছে।

পশ্চিমবঙ্গে সর্বপ্রথম জৈব সার, জৈব কীটনাশক ও জৈবিক কৃষির প্রশিক্ষণ শুরু হয় ২০০৩ সালে। জলপাইগুড়ি শহরের নিকটস্থ গ্রাম, ভাঙ্গাপাড়া অঞ্চলে সরকারি পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিজ্ঞ কৃষিজগতের বিশিষ্ট ব্যক্তি শ্রীনগেন্দ্রনাথ বর্মনের খামারবাড়িতে। কালিংম্পং মহকুমার ৪টি গ্রাম, সিকিমের একাধিক গ্রাম, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর, উত্তর দিনাজপুর, বাঁকুড়া, বর্ধমান জেলায় অনেক গ্রামে জৈবসার, জৈব কীটনাশক, জৈববীজ প্রয়োগের সার্থক পরিণাম দেখা যাচ্ছে। অনেক গ্রামে দেশীয় পদ্ধতিতে কীটনাশক তৈরির সফলতা চোখে পড়ার মতো। সিকিম সরকার তো জৈব সার ছাড়া অন্য কোনও সারের উপযোগিতা নিষিদ্ধ করে দিয়েছে। বর্তমান প্রায় ৬০০০ কিষাণবন্ধু বাংলার ১৬টি জেলাতে নিজেদের সুবিধামতো দেশীয় ভাবনার উপর জোর দিয়ে কৃষিজগতে নতুন আলো আনার উদ্যোগ নিয়েছেন।

ন্যাশনালিস্ট 'লইয়ার্স' ফোরাম

১৯৭৫ সালে স্বৈরাচারী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর দেশব্যাপী জরুরি অবস্থা ঘোষণার ফলে দেশে গণতন্ত্র, বিচার, বাক্ স্বাধীনতা সব কিছু স্তব্ধ হয়ে যায়। প্রয়োজন দেখা দেয় আইনজগতে কোনও সংগঠনের। প্রবীণ-অভিজ্ঞ কয়েকজন আইনজীবী স্বয়ংসেবক কার্যকর্তার মাধ্যমে গঠিত হয়েছে ন্যাশন্যালিস্ট 'লইয়ার্স ফোরাম। প্রতিষ্ঠাকালে উদ্যোক্তারা হলেন কালিদাস বসু, বিনয়কৃষ্ণ রস্তোগী, শম্ভুনাথ ক্ষেত্রী প্রমুখ। প্রতিষ্ঠাকাল ১৯৭৭—কলকাতা শহর।

বিভিন্ন সময় ন্যায় ও প্রতিষ্ঠার জন্য সেমিনার, পত্রপত্রিকা প্রকাশ, আইন পরামর্শ, আইনি লড়াই করার মাধ্যমে আজ আইন জগতে ফোরাম একটি প্রতিষ্ঠিত সংস্থা। এর মাধ্যমে আজ পর্যন্ত কয়েকশো আইনজীবী, বেশ কয়েকজন মাননীয় বিচারপতি জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত হয়েছেন।

বিগত ৩-৪টি আইনি লড়াই-এ সফল্যও পাওয়া গেছে যা সমাজের কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণ স্বরূপ— ২০১০ সালে ২১ থেকে ২৪ অক্টোবর কলকাতার বুকে বিগ্রেড প্যারেড গ্রাউন্ডে আমেরিকার এক সংস্থা বহুকোটি টাকা খরচ করে প্রায় ৫ লক্ষ মানুষকে খৃস্টধর্মে ধর্মান্তরিত করার ষড়যন্ত্র করে। লইয়ার্স ফোরাম অন্য কয়েকটি সংগঠনের সহযোগিতায় এই মারাত্মক ষড়যন্ত্রকে ব্যাহত করে দেয়।

২০১০ সালে তথাকথিত সংখ্যালঘুদের জন্য সরকারি ফ্ল্যাটের ২৬ শতাংশ বরাদ্দের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলাতে জয়লাভ করে।

মুসলমান ও বি সি-দের জন্য বামফ্রন্ট সরকারের ১০ শতাংশ সংরক্ষণের বিরুদ্ধে কলকাতা উচ্চ আদালতে মামলা ঝুলছে। বকরিঈদের সময় গো-হত্যার বিরুদ্ধে মামলা লড়ে অনেক গরুকে বাঁচানো সম্ভব হয়েছে ও সেগুলিকে গোশালাতে পালন করা হচ্ছে।

ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ

বিগত ২০ বছরের কিছু বেশি সময় ধরে ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ মূলত পশ্চিমবঙ্গে হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ও ছাত্রদের মধ্যে কাজ করে চলেছে। এই সংগঠন সামান্য কিছু আন্দোলনাত্মক কর্মসূচি নিলেও এর মূল কাজ হলো গঠনমূলক। সারা পৃথিবীর হোমিওপ্যাথির ইতিহাস পর্যালোচনা করে আমরা এই সিদ্ধান্তে দৃঢ় হয়েছি যে— হোমিও চিকিৎসার বিশুদ্ধতা নষ্ট হবার ফলেই পৃথিবীর অনেকগুলি দেশে হোমিওপ্যাথির প্রভাব ও প্রসার নষ্ট হয়ে গিয়েছে। হোমিওপ্যাথির এমন দূরবস্থায় ভারতীয় হোমিওপ্যাথিক সমাজ বিশুদ্ধ হোমিওপ্যাথির সংরক্ষণ ও প্রসারের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

আজ পর্যন্ত প্রায় ১০টি হোমিওপ্যাথি কলেজ, ৫০ জন হোমিও-অধ্যাপক ও ৩০০০ হোমিও-ডাক্তারদের সঙ্গে সম্পর্ক হতে পেরেছে। রোগী ও চিকিৎসকদের মধ্যে বিশুদ্ধ

হোমিওপ্যাথি ঔষধের প্রয়োগ এক বিরাট সুফল সকলেই অনুভব করছে এবং এর প্রচার ও প্রসার দ্রুততার সঙ্গে বাড়ছে।

বাংলায় 'সংস্কৃতভারতী'

ভারতের আত্মাস্বরূপ সংস্কৃত ভাষাকে পুনর্জাগরণ ও জনপ্রিয় করার জন্য 'সংস্কৃত ভারতী' সংগঠনের মাধ্যমে কাজ করে চলেছে। ২০০৮ সালে আবাসিক বর্গের মাধ্যমে শুরু হলেও বাংলায় কয়েকবছর আগেই আনুষ্ঠানিকভাবে প্রারম্ভ হয়েছিল।

সংস্কৃত ভারতীর মুখ্যবিষয় হলো সম্ভাষণ শিবির। অর্থাৎ প্রতিদিন দুই ঘণ্টা, টানা দশদিন। আজ পর্যন্ত শতাধিক সম্ভাষণ শিবিরের মাধ্যমে প্রায় তিন হাজারের অধিক সংস্কৃতপ্রেমী অংশগ্রহণ করে সহজেই সংস্কৃতভাষী হয়ে উঠেছেন। কেবল সংস্কৃত ছাত্রছাত্রীরাই নয়, সমাজের বিভিন্ন স্তরের— যেমন, শিক্ষক, অধ্যাপক, চিকিৎসক, বৈজ্ঞানিক, সাধুসন্ত, নিরক্ষর এমনকী মুসলমানরাও অংশগ্রহণ করেছেন।

ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ (বালিগঞ্জ), আদ্যাপীঠ, শ্রী অরবিন্দ ভবন কলকাতা, পরমার্থ সাধক সঙ্ঘ (বাঁকুড়া), সরস্বতী শিশু মন্দির, হাওড়া সংস্কৃত সাহিত্য সমাজ, অসম বঙ্গীয় সারস্বত মঠ, হালিসহর নিগমানন্দ মঠ মিশনের কাছ থেকে শিবিরের জন্য সহযোগিতা পেয়ে আসছে।

গত তিন বছরে বিভিন্ন স্থানে সংস্কৃত সম্মেলনে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের উপস্থিতি প্রমাণ করে বর্তমানে সংস্কৃতের প্রয়োজনীয়তা। যেমন— স্বামী জ্ঞানানন্দ সরস্বতী (স্বামী নিগমানন্দ মঠ ও আশ্রমের প্রমুখ), স্বামী মুক্তিকামানন্দ (অধ্যক্ষ, বাঁকুড়া রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশন), প্রখ্যাত সাংবাদিক পথিক গুহ (আনন্দবাজার পত্রিকা), ড. অমলেন্দু দে (চেয়ারম্যান, এশিয়াটিক সোসাইটি), অধ্যাপক সুনন্দ সান্যাল, ডাঃ সুকুমার মাইতি (অধ্যক্ষ, মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ)।

এই বাংলায় যেখানে দীর্ঘদিন শিক্ষাক্ষেত্রে সংস্কৃতকে Dead language (মৃতভাষা) বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, সেই বাংলার সংস্কৃত ভারতী আয়োজিত সম্ভাষণ শিবিরে সাধারণ মানুষের অধিক সংখ্যায় উপস্থিতি প্রমাণ করে সংস্কৃতের প্রতি তাঁদের আন্তরিক আগ্রহ।

বিজ্ঞান ভারতী

সংঘবিচার ও হিন্দুত্বের দর্শন নিয়ে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ধীরে ধীরে বিভিন্ন কার্যক্রম ও প্রত্যক্ষ কাজের মাধ্যমে কিছু প্রভাব ও অনুভব লাভের উদ্দেশ্যে গঠিত হয়েছে দেশব্যাপী এক সংগঠন 'বিজ্ঞান ভারতী'। পশ্চিমবঙ্গে 'বিবেকানন্দ বিজ্ঞান মিশন' নামে বিজ্ঞান চেতনা জাগানোর উদ্দেশ্যে বিজ্ঞান ভারতীর শাখা সংগঠন হিসাবে নিরলসভাবে কাজে ব্রতী হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কাজের শুরু ২০০৪ সালে। ২০০৭ সালে বেলুড় মঠের স্বামী বিবেকানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের সভাগৃহে একটি মনোজ্ঞ সেমিনার আয়োজিত হয়। সেমিনারটির বিষয় ছিল— National Seminar on India Scientific Heritage--Aryabhatta to Harish Chandra। বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্বামী আত্মপ্রিয়ানন্দ মহারাজের সভাপতিত্বে ৬০০ জন বিজ্ঞান জগতের বিদগ্ধ ব্যক্তিত্ব সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন।

'বিজ্ঞান ভারতী' এবং কলকাতার 'বসু বিজ্ঞান মন্দিরের' যৌথ উদ্যোগে বিজ্ঞানী জগদীশচন্দ্রের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে আয়োজিত বিভিন্ন কার্যক্রমে উপস্থিত থাকেন নোবেল বিজয়ী গুগলিয়েলমো মার্কনির নাতি অধ্যাপক মার্কনি, দেবীপ্রসাদ দুয়ারী— ডিরেক্টর বিড়লা তারামণ্ডল, সাহা ইনস্টিটিউটের প্রাক্তন ডাইরেক্টর ডঃ বিকাশ সিনহা, হিউস্টন নাসার বিজ্ঞানী ডঃ প্রবীর বন্দ্যোপাধ্যায় সহ আরও অনেক বিদ্বৎজন।

বিজ্ঞানী আচার্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের ১৫০তম জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে গত ১৭ ফেব্রুয়ারি প্রেসিডেন্সী কলেজে দু'দিনের এক কর্মশালা হয়। এই কর্মশালার উদ্বোধন করেন ভারতের প্রাক্তন রাষ্ট্রপতি ক্ষেপণাস্ত্র বিজ্ঞানী ডাঃ এ পি জে আব্দুল কালাম।

লক্ষ্মীবাঈ কেলকরের জন্মশতবর্ষ পূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে সেবিকা সমিতির মঞ্চে (বাঁ দিক থেকে) প্রতিমা বসু, জ্ঞানানন্দময়ী মা, ড- অর্চনা দত্ত, প্রমীলা তাই মেঢ়ে।

রাষ্ট্রসেবিকা সমিতি ও দুর্গাবাহিনী

সঙ্ঘের ভাবাদর্শের প্রেরণাতে রাষ্ট্রসেবিকা সমিতি, দুর্গাবাহিনী ও অন্যান্য মাতৃশক্তির মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গে অল্পকিছু হলেও নানান কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রসেবিকা সমিতির যাত্রা শুরু ১৯৬৯ সালে। কলকাতার বিড়লা গার্লস হাইস্কুলে অখিল ভারতীয় শিক্ষণ শিবিরের মধ্য দিয়ে ১৯৬৯ সালে সমিতির কাজ শুরু করেন (বাল্যকাল থেকেই সেবিকা) মহারাষ্ট্র থেকে আগতা শ্রীমতী বাসন্তী বাপট। বিবাহ এবং কর্মসূত্রে তিনি কলকাতায় এসেছিলেন। প্রায় সব জেলাতে সমিতির মাধ্যমে কাজ শুরু হয়ে যায়। কিন্তু ১৯৮০-এর পর থেকে বামপন্থী শাসনের কারণে বিশেষ করে সীমান্তবর্তী জেলাগুলোতে সেবিকাদের পরিবারগুলিতে ভীতি প্রদর্শন করা

উত্তর ২৪ পরগণার একটি ত্রাণকেন্দ্রে শরণার্থীদের ত্রাণ বন্টন করছেন সুনীলপদ গোস্বামী। (ফাইল চিত্র)

হয়। শাখাগুলি একে একে বন্ধ হতে থাকে।

এই বছর ভগিনী নিবেদিতার প্রয়াণ শতবর্ষ উপলক্ষে সমিতি মালদাতে একটি কার্যক্রম সম্পন্ন করেছে এবং দার্জিলিং-এ নিবেদিতার স্মৃতিমন্দির সংস্কার করেছে। ২০১১-এ নভেম্বরে কলকাতা শহরে একটি বিশাল কার্যক্রমেরও আয়োজন করেছিল।

পশ্চিমবঙ্গে কল্যাণ আশ্রম, বিদ্যাভারতী ও বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মাতৃশক্তি বিভাগের মাধ্যমে শিশুসংস্কার কেন্দ্র, ছাত্রীনিবাস, স্বাবলম্বন, সেবা ও আন্দোলনের অনেক ধরনের কার্যক্রম সমাজে ও নারীজগতে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছে।

দুর্গাবাহিনীর কাজ বাংলাতে ১৯৯০ সালে শুরু হয়। ১৯৯৪ সালে দিল্লীতে বিশাল মাতৃশক্তি সম্মেলনে বাংলা থেকে কয়েকশো মা-বোন উৎসাহের সঙ্গে যোগদান করেন। বিভিন্ন সময় দুর্গাবাহিনীকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজনৈতিক, সাম্প্রদায়িক ষড়যন্ত্র ইত্যাদি বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে। যেমন ১৯৯৬ সালে কলকাতার বাঙ্গুর ধর্মশালায় দুর্গাবাহিনীর শিবিরে হুগলীর একটি মেয়ে নানান অছিলায় শিবির থেকে মাঝপথে গ্রামে ফিরে গিয়ে পরিবার ও পাড়ার লোকজনের যোগাসাজসে বিশ্বহিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় কার্যকতা স্বর্গীয় মাধব বনহাট্টি, দুর্গাবাহিনীর প্রমুখ সুভদ্রা শর্মা সহ আরও ২ জন কার্যকর্তাকে 'নারী পাচারকারীর' অভিযোগে থানাতে মামলা করে ও নানান অত্যাচার করে। ফৌজদারী মামলা চলে দীর্ঘ ৬ বছর। মামলা চলার পর জনগণের চাপে পড়ে মামলাকারীরা পিছু হটে। মামলা উঠে যায়, কার্যকর্তারা বেকসুর মুক্ত হন। সকলের কিছু ভোগান্তি হয়।

২০০০ সালে হুগলী জেলার পুড়শুড়া হাইস্কুলে দুর্গাবাহিনীর শিবিরে এক মুসলমান ছাত্রী অংশ নেয়। কিন্তু মুসলমান সমাজ থেকে প্রচণ্ড বিরোধিতা আসে, মুসলমানরা স্কুল ঘেরাও করে। যদিও ছাত্রীটির বক্তব্য ছিল, "হতে পারি আমি মুসলমান নারী কিন্তু আমার মনটা হচ্ছে হিন্দু মন"। কিন্তু সার্বিক শান্তি কামনায় শেষ পর্যন্ত ছাত্রীটিকে শিবিরে মাঝপথেই বাড়ি ফিরিয়ে দেওয়া হয়।

শঙ্খনাদ সমরসতা মঞ্চ

সমাজের পিছিয়ে পড়া অবহেলিত কিছু বন্ধু আছেন যাঁদের চর্মকার, ডোম, বাগদী, মতুয়া, মেথর, বাল্মীকি, ধানুক, জোলা, মল্লিক, বুনো, ধোপা, নাপিত, কুমহার ইত্যাদি আরও অনেক জাত-পাতের নামে জানা যায়।

ওইসব বন্ধুরা মূলত সমাজে বিভিন্ন সাফাইয়ের কাজে, সেবার কাজে রত থাকেন। বর্ণ হিসাবে যাঁরা শূদ্র। মূল হিন্দুসমাজের সঙ্গে এঁদের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ সমভাব ও একসঙ্গে ওঠাবসার লক্ষ্য নিয়ে কয়েকজন স্বয়ংসেবকের উদ্যোগে তৈরি হয়েছে এক সমরসতা মঞ্চ। নাম— "শঙ্খনাদ সমরসতা মিশন"। ১৯৯৭ সালে পবিত্র মাঘীপূর্ণিমার দিনে সন্ত রবিদাস জয়ন্তী উপলক্ষে কলকাতার জোড়াবাগান পার্কে যজ্ঞ, পূজা, সহভোজের মাধ্যমে পিছিয়ে পড়া সমাজের বন্ধুদের নিয়ে এক মনোজ্ঞ কার্যক্রম হয়।

কয়েকটি জায়গাতে শিক্ষা ও সংস্কারের কিছু প্রকল্প চলে। ডোম সমাজের কৈলাস মল্লিক ও পাঞ্জাবী চর্মকার কুলদীপ যস্যিকে 'রামশরৎ প্রতিভা সম্মানে ভূষিত' করা হয়। ২০০৪ সালে পূর্বাঞ্চলের দু' দিনের ক্ষেত্রীয় সমরসতা কর্মশালাতে ৭০ জন বন্ধু যোগ দেন যার মধ্যে ওড়িষার ১৮ জন বন্ধু ছিলেন (২ জন মন্ত্রীসহ)।

অনেক রাজনৈতিক বাধা, মুসলমানদের অন্যায় অত্যাচার সমাজের লোকেরাই রুখে দিয়েছে। যদিও বহুজন সমাজ পার্টির লোকেরা সমরসতায় এই কাজের প্রতি নজর রাখে, কিন্তু শক্ত কোন বাধা দেয় না। সামাজিক সমরসতার এই কাজের বিরাট সম্ভাবনা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে— অধিক কার্যকর্তার প্রয়োজন অনুভব হচ্ছে।

হিন্দু জাগরণ মঞ্চ

হিন্দু সমাজের বিশ্বাস, মনোবল, আস্থা বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে তৎকালিক কিছু ঘটনা, দুর্ঘটনার বিষয়ে বিশেষ করে সীমাবর্তী জেলাগুলোতে "হিন্দু জাগরণ মঞ্চের" মাধ্যমে হিন্দু জাগরণের কাজ শুরু হয়েছে। দক্ষিণবঙ্গে নদীয়া, মুর্শিদাবাদ ও দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলাতে সংগঠনাত্মক ও সমাজ জাগরণমূলক কিছু কাজ করা সম্ভব হয়েছে।

মুসলমান সমাজের যুবকেরা অনেকস্থানে হিন্দু মেয়েদের ফুসলিয়ে নিয়ে যাওয়ার পর এমনকী বাংলাদেশে পালিয়ে গেলেও পুলিশ-প্রশাসনের সক্রিয় সহযোগিতায় ও সমাজের সমর্থনে ওই সব হিন্দু মেয়েকে উদ্ধার করা সম্ভব হয়েছে।

অপরদিকে হিন্দু ছেলেরা 'লাভ জেহাদের' বিরুদ্ধে অনেক মুসলমান মেয়েকে বিবাহ করতে চাইলে হিন্দু পরিবার থেকেই বাধা আসে। কিন্তু নানান ধার্মীয় মঠ, মন্দির ও জাগরণ মঞ্চের বিশেষ তৎপরতায় সেই বাধা অনেকাংশে কেটে যায়। অধিকাংশই শিক্ষিত

ছেলেমেয়েদের মধ্যে এই প্রেমপ্রীতি ভালোবাসার ঘটনা দেখা যায়। শুদ্ধি যজ্ঞ ও হিন্দুসংস্কারের মাধ্যমে আজ পর্যন্ত প্রায় ১২০ জোড়া ছেলেমেয়ে বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হয়ে হিন্দু নামাঙ্কিত হয়ে নতুনভাবে হিন্দু জীবনযাপন করছেন। যেমন সৌরভ শেখ বর্তমানে হয়েছে সৌরভ কর্মকার, তার শুদ্ধিকরণ বেলডাঙা হিন্দুমিলন মন্দিরে হয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জেলার ডোমকল থানার অন্তর্গত কয়েকটি গ্রাম থেকে হিন্দু মেয়েদের বাংলাদেশে পাচারের সময় প্রশাসনের সাহায্যে জাগরণ মঞ্চ ২০-২৫টি মেয়েকে উদ্ধার করতে পেরেছে। বহরমপুর শহরে একটি পুরো মুসলমান পরিবার হিন্দুসংস্কার নিয়ে পূজাপাঠ বারোমাস করছেন—হিন্দুসমাজের অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। কলকাতার তারাতলা অঞ্চলের এক মুসলমান মেয়ে কালীঘাট মন্দিরে শুদ্ধিকরণের মাধ্যমে অতি উল্লাসে হিন্দুধর্ম গ্রহণ করেছে। বিভিন্নস্থানে মুসলমান থেকে হিন্দুধর্ম ও বিশ্বাসে ফিরে আসার ধর্মীয় কার্যক্রমে হিন্দু জাগরণ মঞ্চকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় ২০।২৫টি আশ্রম ও মঠ-মন্দির সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছে। হিন্দুসমাজের উপর রাজনৈতিক দিক থেকে নানান ধরনের আঘাত আসছে। তার অন্যতম একটি 'প্রিভেনশন অফ কম্যুনাল অ্যান্ড টার্গেটেড ভাওলেন্স বিল' যা কেন্দ্রীয় সরকার লোকসভাতে পাশ করানোর জন্য উদ্যোগ নিয়েছে। এই বিল পাশ হয়ে গেলে হিন্দু সমাজ ও সংগঠনগুলি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হবে। ওই বিলের ঔচিত্য ও ক্ষতিকারক দিকগুলি জনসাধারণ ও সংবাদ মাধ্যমের সামনে তুলে ধরার জন্য গত ৯ জুলাই ২০১১ কলকাতায় একটি সফল সেমিনারের আয়োজন হয়। পরবর্তীতে অন্যান্য সংগঠনের সহযোগিতায় কলকাতা শহর জুড়ে ২৫ জুলাই ব্যাপকভাবে প্রচার অভিযান চালানো হয়। বিগত ৬ জুলাই দক্ষিণ ২৪ পরগণার ক্যানিং সহরে প্রায় ২৫০ জন কার্যকর্তার উপস্থিতিতে সভা ও মিছিল সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। দেখা যাচ্ছে, বাধা, সংঘর্ষ ইত্যাদি থাকা সত্ত্বেও হিন্দুসমাজ বাঁচার তাগিদে ও সংগঠিতভাবে মোকাবিলার জন্য তৈরি হচ্ছে। তবে এই গতি এখনও মন্থর। জাগরণের গতি ও বিস্তার দ্রুত হোক এই প্রত্যাশা সকলে অনুভব করছেন।

স্বনির্ভর গো-শালা

অক্ষম ও বৃদ্ধ গোসম্পদকে পরিপালন সহ দুধেলা গরুর আমৃত্যু- সেবার সংকল্প নিয়ে ব্যবস্থিতভাবে 'ক্যালকাটা পিঁজরাপোল সোসাইটি' তৈরি হয় ১৯৭১ সালে। যদিও তার অনেক বৎসর পূর্ব থেকেই গো-শালাগুলি চালু ছিল। কিন্তু অত্যন্ত অব্যবস্থিত অবস্থায় ছিল। গো-শালাগুলির ওই দুরবস্থার কথা ভেবে কিছু স্বয়ংসেবক কার্যকর্তা ও সঙ্ঘের মনোভাবাপন্ন প্রায় ২০ জন সহৃদয় ব্যক্তি উৎসাহ ও সংকল্প নিয়ে গো-সেবার এই পবিত্র কাজে আত্মনিয়োগ করেন। বর্তমানে লিলুয়াতে (হাওড়া) ৬০ বিঘা জমি, কল্যাণীতে ৩৫০ বিঘা জমির উপর এবং সোদপুর ও রাণীগঞ্জ এই চারস্থানে ব্যবস্থিতভাবে গো-শালাগুলি চালু আছে। বর্তমানে প্রায় ২৮০০ গোধন সেবা পাচ্ছে যার মধ্যে দুধেলা, গরু আছে প্রায় ৩০০। আমৃত্যু গোধনকে সেবা গোশালাগুলির মুখ্য উদ্দেশ্য। বর্তমানে গোপালনের জন্য বাৎসরিক প্রায় ২½ কোটি টাকা ব্যয় হয় যা দান ও দুধ, সার, গোবর, গোমূত্র বিক্রী করে স্বনির্ভরতা বজায় রেখেছে। প্রায় ৪০০ কর্মচারী গোপালন, জৈব সার, কেঁচুয়াসার বিশেষভাবে তৈরি করছে।

গোপাষ্টমী ও জগদ্ধাত্রী পূজার সময় মহাসমারোহে মেলা হয়। চলে গো-পূজন। বেশ কয়েকদিন ধরে মেলাতে লক্ষাধিক গো-প্রেমিকদের অনেক স্থান থেকে সমাগম হয়। সকলের সার্বিক সহযোগিতাতে গোধন পরিপালনের এক সামাজিক প্রভাব উপলব্ধি করা যায়। সমস্ত প্রকল্পটি উন্নতির পথে।

(পূর্বঘোষিত রচনাটি স্বস্তিকা নববর্ষ সংখ্যায় স্থান সংকুলান না হওয়ার জন্য এই সংখ্যায় প্রকাশ করা হলো।)

With Best Wishes :-

BDJ STAMPINGS INDUSTRIES LTD.

ISO 9001 : 2000 Company

8, Rai Charan Paul Lane, Kolkata - 700 046

জীবনের প্রতি পদে
থাকে যদি ডাটা
জমে যায়
রান্নাটা
DUTA
Chicken Mutton
Sabji Mix
Kashmiri MIRCH POWDER
SUPER Cumin Powder
SUPER Turmeric Powder
Chilli Powder
SUPER Coriander Powder
BLACK Pepper Powder
ডাটা
গুঁড়ো মশলা ও পাঁপড়
কৃষ্ণ চন্দ্র দত্ত (কুক্‌মী) প্রাঃ লিঃ

লালগড়ে নতুন মন্দিরের উদ্বোধন

মন্দির উদ্বোধনের পর বেরিয়ে আসছেন স্বামী শ্রুতিসারানন্দ, স্বামী দেবানন্দজী ও স্বামী নীলরুদ্রানন্দ মহারাজ (বাঁ দিক থেকে)।

লালগড়ে যেন নতুন সূর্যোদয় ঘটল। ঘটনা গত ৬ এপ্রিলের। মহাসমারোহে হাজার মানুষের উপস্থিতিতে 'শংকর বাণপ্রস্থ আশ্রম' তপোবনের নতুন মন্দিরের দ্বারোদ্‌ঘাটন করলেন ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ স্বামী নীলরুদ্রানন্দ মহারাজ। আর গর্ভগৃহের উন্মোচন করলেন শ্রীরামকৃষ্ণ মঠ ও আশ্রমের পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার অধ্যক্ষ শ্রীমদ্ স্বামী শ্রুতিসারানন্দ মহারাজ। এরপর ধর্মসভা। স্বামী শ্রুতিসারানন্দ মহারাজ বলেন, মন্দিরে বিগ্রহ আর সমাজে মানুষ— উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান করে সেবা করলেই ঈশ্বরসেবা। মন্দিরে এলে মনের মালিন্য দূর হয়। শ্রীচৈতন্য ও শ্রীরামকৃষ্ণের প্রদর্শিত পথে আমাদের চলতে হবে। এজন্য নামকীর্তন, সাধুসঙ্গ এবং নির্জনে ঈশ্বরচিন্তা। একদিকে ভগবদ্ আরাধনা, অন্যদিকে সংসার— দুইই পাশাপাশি চালিয়ে যেতে হবে।

পরবর্তী বক্তা ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘের তরুণ সন্ন্যাসী স্বামী নীলরুদ্রানন্দ ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনায় বলেন, ধর্মসংস্থাপক শ্রীকৃষ্ণকেই আজ প্রয়োজন। হিন্দুরা কোনওদিন বিদেশীদের উৎপীড়ন ও আক্রমণ করেনি। হিন্দুদের আর কোনও দেশ নেই— ভারতবর্ষ ছাড়া। পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে আগত কোটি কোটি হিন্দুদের ভারতে আশ্রয় নিতে হয়েছে। আজ যদি হিন্দুরা সংগঠিত না হয় তাহলে ভারত থেকে বিতাড়িত হলে হিন্দুরা কোথায় যাবে!

এরপর পশ্চিমাঞ্চল উন্নয়ন মন্ত্রী সুকুমার হাঁসদা তাঁর ভাষণে বলেন, এসময়ে লালগড় এলাকায় শান্তি-সুস্থিতির একান্ত প্রয়োজন। মন্দির এই এলাকার গর্ব। সকলে এখানে একত্রিত হয়ে মনের কথা ভগবানের কাছে নিবেদন করতে পারবেন। লালগড়ের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক অভিজিৎ সামন্ত মন্দির প্রতিষ্ঠার ভূয়সী প্রশংসা করেন। ধর্মসভায় সভাপতিত্ব করেন প্রবীণ শিক্ষাবিদ্ অবনীভূষণ মণ্ডল। সভা পরিচালনা করেন মনীশ রায়। এছাড়াও মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন লালগড় রামকৃষ্ণ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শংকর পাল। লালগড়ের এবং আশপাশের বিভিন্ন গ্রামের কয়েক হাজার মানুষ এদিন আশ্রমে প্রসাদ গ্রহণ করেন। গ্রামবাসীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে সঙ্ঘকাজে হাত লাগান। দুজনের নাম না বললে তা অসম্পূর্ণ হবে--- বীরকাঁড় গ্রামের মাস্টারমশায় ইন্দ্রজিৎবাবু এবং নেতাই গ্রামের অলকানন্দ ঘোড়ই। দলমত নির্বিশেষে আশ্রম সবাইকে মিলিয়ে দিয়েছে।

সমাবেশ সমাচার

বি এম এসের জুট কর্মীদের বার্ষিক সভা

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের বরাহনগর জুট মিলের কর্মীবৃন্দের বার্ষিক সাধারণ সভা গত ১৬ মার্চ আলমবাজারে সভা ভবনে অনুষ্ঠিত হয়। শতাধিক কর্মীর উপস্থিতিতে অনুষ্ঠিত এই সভায় উপস্থিত ছিলেন জুটের সর্বভারতীয় সংগঠন সম্পাদক শিবনাথ মাহাতো, প্রদেশের সহ-সভাপতি দিলীপ পাল, কণক পাণিগ্রাহী। এবং সঙ্ঘের কলকাতা মহানগরের ব্যবস্থা প্রমুখ জীবন্ময় বসু ছিলেন বিশেষ অতিথি হিসাবে।

রাজস্থান পরিষদের রাজস্থান দিবস

অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখছেন প্রাক্তন বিচারপতি গিরিধর মালব্য।

'দারিদ্র্যের সঙ্গে জীবন অতিবাহিত করলেও পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য দেশ ও সমাজের জন্য সেবাব্রতের এক অনুকরণীয় উদাহরণ হিসেবে নিজের জীবনকে সবার সামনে তুলে ধরেছিলেন। তাঁর বহুমুখী ব্যক্তিত্ব ও কর্তৃত্ব সকলকে প্রেরণা ও উৎসাহ প্রদানকারী।'

উপরের বক্তব্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য-এর নাতি এবং এলাহাবাদ হাইকোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি গিরিধর মালব্যের। গত ১ এপ্রিল কলকাতার অসোয়াল ভবনে রাজস্থান পরিষদ আয়োজিত ৬৩তম রাজস্থান দিবসে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ও কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ১৫০ তম জন্মবার্ষিকী ছিল সভার আলোচ্য। প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি আরও বলেন, রবীন্দ্রনাথই মালব্যজীকে সর্বপ্রথম 'মহামনা' উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন। অনুষ্ঠানের প্রধান বক্তা পণ্ডিত অমিতাভ ভট্টাচার্য বলেন, একজন কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় এবং অপরজন বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা। এটা তাঁদের দূরদৃষ্টির পরিচায়ক। বিশিষ্ট বক্তা ডঃ প্রেমশঙ্কর ত্রিপাঠী তাঁর ভাষণে মহামনা মালব্যজীর চারিত্রিক দৃঢ়তা, সত্যনিষ্ঠা এবং তেজস্বিতার কথা উল্লেখ করেন।

অন্যান্য বক্তাদের মধ্যে ছিলেন যুগলকিশোর জৈথেলিয়া প্রমুখ। স্মরণিকার আবরণ উন্মোচন করেন প্রধান অতিথি গিরিধর মালব্য।

এদিনকার অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন প্রবীণ সাহিত্যিক ও অধ্যাপক ডঃ কৃষ্ণবিহারী মিশ্র। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন ভগবত কথাকার পণ্ডিত শ্রীকান্ত শাস্ত্রী। স্বাগত ভাষণ দেন পরিষদের সভাপতি শার্দুল সিং জৈন। সভা পরিচালনা করেন রুগলালজী সুরানা। মঞ্চস্থ অতিথিদের শাল দিয়ে স্বাগত জানান পরিষদের পক্ষে সর্বশ্রী বংশীলাল শর্মা, মোহনলাল পারেখ, জয়প্রকাশ সেঠিয়া, সম্পত মানধনা, অনুরাগ নোপানী এবং শ্রীমতী দুর্গা ব্যাস। সবশেষে, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন অরুণপ্রকাশ মল্লাবত। অনুষ্ঠান স্থল একেবারে কানায় কানায় পরিপূর্ণ ছিল।

সংস্কার ভারতীর কার্যকর্তা নৈপুণ্য বর্গ

সংস্কার ভারতী দক্ষিণবঙ্গ আয়োজিত দু' দিন ব্যাপী কার্যকর্তা নৈপুণ্য বর্গ অনুষ্ঠিত হলো কল্যাণ ভবনে গত ১৭ ও ১৮ মার্চ ২০১২।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের প্রবীণ প্রচারক কেশব দীক্ষিত, সংস্কার ভারতীর বিকাশ ভট্টাচার্য, সুভাষ ভট্টাচার্য, এবং দক্ষিণবঙ্গ প্রান্তীয় সভাপতি বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব তপন গাঙ্গুলী ও পূর্ণচন্দ্র পুইতুন্ডী।

কার্যকর্তা নৈপুণ্যবর্গে অন্যতম বক্তা ছিলেন বিদ্যার্থী পরিষদের সংগঠন সম্পাদক অমিতাভ চক্রবর্তী, অরুণ চক্রবর্তী এবং অখিল ভারতীয় শৈক্ষিক সঙ্ঘের কেন্দ্রীয় সমিতির সদস্য অজিত বিশ্বাস।

পাকড়ী গ্রামে শিশু মন্দিরের উদ্বোধন

গত ২৫ মার্চ, হুগলী জেলার পাকড়ী গ্রামে দাশরথিদেব যোগেশ্বর সরস্বতী শিশু মন্দিরের উদ্বোধন অনুষ্ঠিত হলো। প্রদীপ প্রজ্জ্বলনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন ডুমুরদহ উত্তমাশ্রমের আশ্রমাচার্য শ্রীমৎ অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী। সঙ্গে ছিলেন ওই আশ্রমেরই তিতিক্ষানন্দ ব্রহ্মচারী। সভায় দুই শতাধিক নারী-পুরুষ উপস্থিত ছিলেন। বাসুদেব ঘোষ সরস্বতী শিশু মন্দির স্থাপনের পটভূমি এবং গৃহ নির্মাণ কার্যের সমবেত প্রয়াসের উল্লেখ করেন। এরপর গণেশ চন্দ্র মণ্ডল, রাধাকান্ত বিশ্বাস, নারায়ণ চন্দ্র মজুমদার, গণেশ চন্দ্র দাস,

পরিষদের পক্ষে আশুতোষ দে এবং বিজয় রায়, 'স্বস্তিকা'র সম্পাদক ডঃ বিজয় আঢ্য এবং সমাজ সেবা ভারতী, পশ্চিমবঙ্গের সভাপতি সীতেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য সময়োচিত ভাষণ দেন। প্রধান অতিথির ভাষণে অধ্যাপক সুনীলেন্দু ভট্টাচার্য শিক্ষার অবক্ষয়, নীতি-নির্ধারণে অদূরদর্শিতার উল্লেখ করে, বিদ্যাভারতীর মাধ্যমে জাতীয় জীবনে জাতীয় শিক্ষা রূপায়ণের দিশা নির্দেশ করেন। শ্রীমৎ অভয়ানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজ সভাপতিরূপে ভাবাবেগপূর্ণ বক্তব্য রেখেছেন। সমগ্র অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন কার্যকরী সমিতির সম্পাদক রবীন্দ্রনাথ ঘোষ।

এখানে উল্লেখনীয় বিষয় হলো, দাশরথিদেব যোগেশ্বরের দুই পৌত্র, দিগসুই নিবাসী বাসুদেব মুখোপাধ্যায় এবং গোবিন্দদেব মুখোপাধ্যায় বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের জন্য ১৮ শতক জমি দান করেছেন।

হিন্দীর শতবর্ষ

নিজস্ব প্রতিনিধি ॥ ল্যান্ডাউর ল্যাঙ্গোয়েজ স্কুলের নাম পশ্চিমবঙ্গে কেউ কখনও শোনেননি। দেশের ১৩০ কোটি জনসংখ্যার মধ্যে হাতে গোণা কতজন এই নামটি শুনেছেন তাই বা কে জানে! অথচ জানাটা দরকার। কারণ যে পাঁচমিশেলী ভাষাটাকে আমরা 'রাষ্ট্রভাষা'র মর্যাদা দিয়েছি সেই হিন্দী ভাষা শিক্ষার প্রাচীনতম বিদ্যালয়ের তকমা দেওয়া যেতে পারে এই ল্যান্ডাউর ল্যাঙ্গোয়েজ স্কুলটিকে। জায়গাটা মনোরম প্রকৃতি দিয়ে ঘেরা উত্তরাখণ্ডের মুসৌরীর খুব কাছে। হিন্দী ভাষাশিক্ষার সেখানে শতবর্ষ পূর্তি হচ্ছে এবার। পাঠক অপেক্ষা করুন, বিস্ময়াহত হতে আরও কিছু বাকি রয়েছে! এহেন হিন্দীভাষা শিক্ষার স্কুলটি অবস্থিত একটি ১০৮ বছরের গীর্জার মধ্যে, কেল্লগ মেমোরিয়াল চার্চ। ভারতের মানুষকে ধর্মান্তরিত করা চার্চের ইতিহাসে একটি স্বভাবসিদ্ধ মৌলিক ঘটনা। কিন্তু কোনও একটি ভারতের রাষ্ট্রভাষাকে আঁকড়ে ধরেছে মূলস্রোতে মিশে যেতে, এই ঘটনা অভিনব বইকী!

যদিও ল্যান্ডাউর ল্যাঙ্গোয়েজ স্কুল শুরু হয়েছিল অন্য এক কারণে। স্থানীয় মানুষজনের সঙ্গে তাদের কর্মচারীদের যাতে কথাবার্তায় অসুবিধে না হয় সেদিকে লক্ষ্য রেখেই তৎকালীন বৃটিশ সরকার হিন্দীভাষা শিক্ষার ওপর জোর দেয়। তারা এ ব্যাপারে নিয়োগ করে মার্কিন প্রেসবাইটেরিয়ান মিশনারী রেভা ঃ স্যামুয়েল হেনরি কেল্লগ-কে, ১৮৬০ সালে। তিনি হিন্দী ভাষা শিক্ষার কোর্স চালু করেন, তাঁকে সহযোগিতা করেন এডউইন গ্রিভিস এবং টি এফ কামিংস নামে আরও দুই পাদ্রী। ১৯১২ সালে মুসৌরীতে চাইল্ডারজ লজে ভিক্টোরিয়া ম্যানসনে চালু হয় হিন্দী ভাষা শিক্ষার এই প্রতিষ্ঠানটি। সাত বছর পর রেভারেন্ড কেল্লগের নামাঙ্কিত কেল্লগ মেমোরিয়াল চার্চে উঠে আসে স্কুলটি।

বর্তমান স্কুলে ঘরের সংখ্যা ১৫। দু'টো তলা জুড়ে রয়েছে। এককালে ঔপনিবেশিক শাসনতন্ত্রের বাধ্যবাধ্যতায় স্থানীয় ভাষা-শিক্ষার গুরুত্ব বুঝে চালু হয়েছিল এই ল্যান্ডাউর ল্যাঙ্গোয়েজ স্কুলটি। '৪৭-র পর সে আবশ্যকতা আর থাকে না। কিন্তু সহধর্মী আর পাঁচটি চার্চের মতো ধর্মান্তরকরণের খেলায় না মেতে, ভারতীয় মূল স্রোতধারায় মিশে যাবার তাগিদ থেকে হিন্দী ভাষাটাকেই আরও বেশি করে আঁকড়ে ধরে চার্চ কর্তৃপক্ষ।

শুনলে আশ্চর্য হবেন, প্রতি বছর অন্তত শ' পাঁচেক ছাত্র-ছাত্রী ভর্তি হন এখানে। এঁদের অধিকাংশই কিন্তু ইউরোপীয়। শুধু হিন্দী-ই নয়, হিন্দীর পাশাপাশি গুজরাটি এবং তামিল ভাষা শিক্ষারও ব্যবস্থা রয়েছে এখানে।

Ori Plast

P.V.C. Threaded Pipes. For deep Tubewell & general sanitation. Substitutes to conventionnal G.I. Pipes

Authrorised Distributor :

NATIONAL PIPE & SANITERY STORES

54, N. S. Road. Kolkata-700001. Ph. : 2210-5831, 2210-5833
15, College Street, Kolkata-700012 Ph : 2241-7149 / 8174

PARTHA SARATHI CERAMICS

4, College St. Kalkata-700012. Ph. :2241-6413/5986

With Best Compliments From :-

36, Basement, 8, Camac Street,
Kolkata - 700 017, Phone : 22827928

জাতীয় মূকাভিনয় উৎসব

দেবাদিত্য চক্রবর্তী

মূকাভিনয় নিয়ে গবেষণা এবং মূকাভিনয়ের প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্যে তৈরি হয়েছিল 'ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটার।' এদেরই উদ্যোগে গত ২৪ থেকে ৩০ মার্চ পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল জাতীয় মূকাভিনয় উৎসব। সহযোগিতায় ছিল তথ্য সংস্কৃতি দফতর।

অনুষ্ঠানে শুধুমাত্র অভিনয়ের প্রদর্শনই নয়, ছিল সারাদিনব্যাপী কর্মশালাও। প্রতিষ্ঠানের কর্ণধার পদ্মশ্রী নিরঞ্জন গোস্বামীর তত্ত্বাবধানে চলছিল কর্মশালা। ছাত্র-ছাত্রীদের মাইমে চলার ছন্দ এবং টাইমিং-এর গুরুত্ব, লাইন অফ্ গ্র্যাভিটির মাধ্যমে শরীরের ব্যালেন্স রাখা, মুন ওয়াক ইত্যাদির প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছিল।

প্রদীপ জ্বালিয়ে উৎসবের উদ্বোধন করেন নিরঞ্জন গোস্বামী। তাঁর বক্তব্য অনুসারে, সামর্থ্যের অভাবে ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও অনেককে কর্মশালায় সুযোগ দেওয়া যায়নি। যদিও এবার ভারতের বিভিন্ন রাজ্য এবং বাংলাদেশ মিলিয়ে প্রায় কুড়িটি দল এই উৎসবে অংশগ্রহণ করেছেন। নতুন প্রজন্মের মধ্যেও আগের তুলনায় অনেক আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে মূকাভিনয় সম্পর্কে। পঞ্চাশ বছর আগে যেখানে কিছু বাঁধাধরা গতে কাজ হোত, তার তুলনায় এখন অনেক নতুন নতুন বিষয় ভাবনা নিয়ে প্রযোজনা হচ্ছে। চলছে নানা পরীক্ষা- নিরীক্ষাও। এ বিষয়ে ভারত সরকারও সহযোগিতা করছেন। শিল্পীদের স্কলারশিপ প্রদান করা হচ্ছে। সব মিলিয়ে মাইম-শিল্প বর্তমানে বেশ ভালো জায়গায় দাঁড়িয়ে। অবশ্য তারই মধ্যে আক্ষেপ এই যে পর্যাপ্ত অর্থের অভাবে উৎসবের প্রচার সেভাবে করা যায়নি। কারণ সাধারণ মানুষ যতো জানবেন, দর্শক সংখ্যা ততো বাড়বে এবং মাইম শিল্প উপকৃত হবে।

উৎসবের প্রথম নিবেদন ছিল ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটারের— দি গ্রেট লিডার স্বামী বিবেকানন্দ। স্বামীজীর আদর্শে অনুপ্রাণিত মহারাজ এবং ব্রহ্মচারী সন্ন্যাসীরা কীভাবে আর্তের সেবা করছেন, নিরক্ষরকে সাক্ষর করার চেষ্টা করছেন এবং স্বামীজির 'উত্থিষ্ঠত জাগ্রত' বাণীকে প্রচার করছেন তা বিভিন্ন ছোট ছোট ঘটনার মধ্যে দিয়ে দেখানো হলো। বাস্তবমুখী পোষাক এবং সুন্দর অভিব্যক্তি ঘটনাবলীতে প্রাণসঞ্চার করেছে। মঞ্চে স্বামীজীর পূর্ণাবয়ব চিত্রের উপস্থিতি নিবেদনে এক আবেগের সঞ্চার করেছে।

পন্ডিচেরীর দ্রুপদ গাঁওকর তার প্রথম অভিনয়ে মানবশিশু এবং চারাগাছকে তুলনা করে দেখিয়েছেন— শিশুদের মতো চারাগাছকেও ভালোবেসে পরিচর্যা করলে সে ফুল ফল প্রদান করে। দূষণের পরিমণ্ডলে এই বৃক্ষপ্রীতি একটি সামাজিক আবেদন রেখেছে।

ওঁর দ্বিতীয় অভিনয়টি একটি কৌতুকনাট্য। নিজেকে বিরাট শক্তিশালী ক্যারাটেবিদ মনে করা এক ব্যক্তি বড়ো বরফের চাঁই ভাঙতে গিয়ে শেষে কীভাবে রণে ভঙ্গ দেয় তাই নিয়েই ঘটনাটি সাজিয়েছেন দ্রুপদ। হাল্কা চালের এই নাটিকাটি হাস্যরসে পূর্ণ।

জলের এক নাম জীবন। আবার এই জল-ই যে মানুষের মৃত্যুর কারণও হতে পারে তাই

অভিনয় করলেন চট্টগ্রামের প্যান্টোমাইম দল। বাংলাদেশের উপকূলবর্তী অঞ্চলের শান্ত স্বাভাবিক জীবনে আক্রমণ হানে আয়লা নামক বিধ্বংসী ঝড়। গোটা গ্রাম প্লাবিত হয়। খাদ্যাভাবে, বিশুদ্ধ জলের অভাবে মৃত্যুবরণ করতে থাকে লোকেরা। এই নিয়েই ছিল মূক-অভিনয়— বাঁচার সংগ্রাম। এই নাটকে গ্রাম্যজীবন এবং ঝড়ের তাণ্ডব বোঝাতে শিল্পীরা দারুণ অভিনয় করেছেন। এই সঙ্গে অবশ্যই বলতে হয় আবহ সঙ্গীত প্রদানে পারদর্শিতার কথা।

ওঁদেরই আরেকটি নাটক --- ফ্রিডম। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের পটভূমিকায় সশস্ত্র যুদ্ধে গ্রামবাংলার অংশগ্রহণ এই নাটকের বিষয়। এই প্রযোজনায় আলোকসম্পাত বিশেষভাবে প্রশংসনীয়। গোয়ার হনস্ থিয়েটারের নাটক ছিলো--- ইভ। আদিম যুগ থেকে নিরন্তর নারী-পুরুষের প্রেম ও প্রতারণার মাধ্যমে পুরুষের বহুগামী স্বভাবের বর্ণনা করা হয়েছে এই মূক অভিনয়ে।

মধ্যপ্রদেশের ইন্দ্রবতী আকাদেমির নিবেদন ছিল, দুই চোর ও এক পুলিশকে নিয়ে নানান মজার ঘটনা। লোকঠকানো চোর দুটি নানা ভাবে পুলিশকে হেনস্থা করলেও শেষ দৃশ্যে তাদের বোধোদয় হয়। তারা আর চুরি না করার প্রতিশ্রুতি করে। সেই সঙ্গে দর্শকদের কাছেও আবেদন জানায় অনৈতিক কাজ না করার জন্য। মজার মধ্য দিয়ে নৈতিকতার এই আবেদন আজকের দিনে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

তামিলনাড়ুর কলা অনন্তপুরাগ্রুপ অভিনয় করলেন বর্তমানে মানুষের মধ্যে মোবাইল ফোন ব্যবহারের বাহুল্য নিয়ে। আজকাল প্রায়ই শোনা যায় মোবাইল কানে লাইন পেরোতে গিয়ে ট্রেনে কাটা পড়ার সংবাদ। শিল্পীরা অভিনয়ের মধ্য দিয়ে দর্শককে মোবাইলের অবাঞ্ছিত ব্যবহার থেকে নিরত থাকতে অনুরোধ জানালেন। সবচেয়ে আকর্ষণীয় ঘটনা হলো, পুরো অভিনয়টিই করা হলো ঢোলের ছন্দে।

কর্ণাটকের রঙ্গায়ানা গ্রুপ মানব সভ্যতার বিভিন্ন স্তর অভিনয় করে দেখালেন। আদিম মানুষের জীবন থেকে চাষবাসের শুরু এবং রাজদণ্ডের আবির্ভাব থেকে ক্রমশ আধুনিক মানুষে রূপান্তর, তারপর যন্ত্র সভ্যতার অগ্রগতি এবং শেষ পরিণতি অ্যাটমবোমার বিস্ফোরণ। শেষে বোমায় নিহত, পঙ্গু মানুষদের মাঝে ধরিত্রীমাতার সজল চোখে বিচরণের দৃশ্যে পরিচালকের চিন্তাশক্তির এবং অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়।

হরিয়ানার একটি দলের অভিনয়ের বিষয় ছিল কমনওয়েলথ গেমস। দৌড়, বক্সিং, ওয়েটলিফটিং ইত্যাদি ক্রীড়াবিদদের হুবহু অনুকরণ করলেন শিল্পীরা। এরমধ্যে জড়িয়ে গেল ডোপিং প্রসঙ্গও। ডোপিং করার অপরাধে বিজয়ী খেলোয়াড়ের পদক ছিনিয়ে নেওয়া হলো। প্রতিটি ঘটনাই শুধুমাত্র শারীরিক অঙ্গভঙ্গির মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে দেখালেন হরিয়ানার শিল্পীরা।

কর্মশালাভিত্তিক কয়েকটি প্রযোজনাও দেখানো হলো। যেমন একটি নাটকে টিভির রিয়েলিটি শো-কে এবং তার বিচারকদের ব্যঙ্গ করা হয়। অপর একটি নাটকে শিল্পীর মনস্তত্ত্বকে তুলে ধরা হয়েছে। সাধারণ মানুষ যা বোঝে না— অনেক টাকার থেকেও শিল্পীর কাছে তার সৃষ্টিই যে বেশি মূল্যবান, ছোট একটি ঘটনার মধ্য দিয়ে তা দেখানো হলো। আরেকটি প্রযোজনায়, নির্বিচারে গাছ কাটার কি কুফল হতে পারে তা দেখানো হলো।

মূকাভিনয় শিল্পকে জনপ্রিয় করার ক্ষেত্রে এই রকম উৎসবের প্রয়োজন খুবই বর্তমানে। ইন্ডিয়ান মাইম থিয়েটারের পাশাপাশি অন্যান্য দলও যদি এই রকম উৎসবের আয়োজন করে তাহলে শিল্পীদের পরস্পরের মধ্যে আদান প্রদানের মাধ্যমে মাইম শিল্পটি উপকৃত হবে।

শব্দরূপ-৬২২ ডাঃ শান্তনু গুড়িয়া

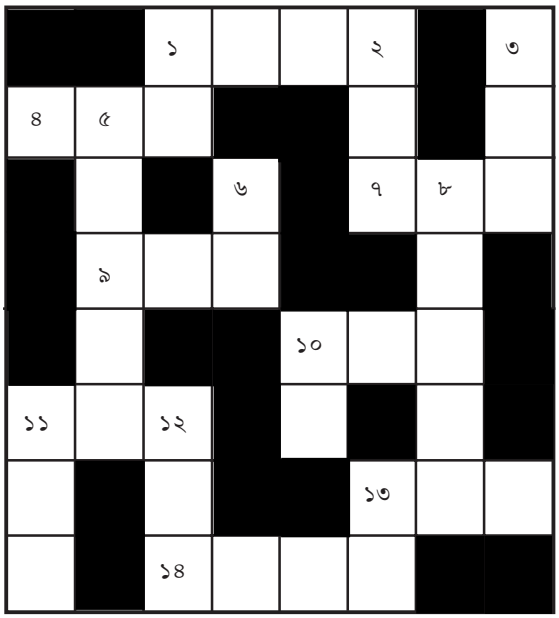

সূত্র :

পাশাপাশি : ১. যোগসূত্র ও পাণিনিভাষ্য রচয়িতা ঋষি, **৪.** সমরেশ বসু-সৃষ্ট কিশোর চরিত্র, শেষার্ধে বৃত্ত, **৭.** জিহ্বা, **৯.** চাঁদেরও এটি থাকে, **১০.** শ্রীকৃষ্ণের মন্ত্রী, **১১.** শব্দালংকার বিশেষ; প্রথমার্ধে মৃত্যুর দেবতা, **১৩.** হত্যা, বধ, **১৪.** সার্বভৌম নরপতির যজ্ঞবিশেষ।

উপর-নীচ : ১. ২৪ সেকেন্ড কাল; মাংস, **২.** মানবদেহের বৃহত্তম অঙ্গ; এর রোগ হলো জন্ডিস, **৩.** কবিকঙ্কণ চণ্ডীতে ধনপতি সওদাগরের প্রথমা পত্নী, **৫.** বৈকুণ্ঠ; বিষ্ণুর আলয়, **৬.** বিরাট-গৃহে যুধিষ্ঠিরের ছদ্মনাম, **৮.** ব্রহ্মচর্যের অন্তে গৃহস্থাশ্রমে প্রবেশ। স্নাতকোত্তর ছাত্রগণকে উপাধি-বিতরণার্থ সভা, **১০.** হিমালয়-মেনকার কন্যা, পার্বতী, **১১.** উত্তর ভারতের নদী বিশেষ, কালিন্দী, যমের ভগিনী, **১২.** ওলাওঠা রোগ, বিসূচিকা, **১৩.** অশ্ব; বিকল্পসূচক।

সমাধান
শব্দরূপ-৬১৯
সঠিক উত্তরদাতা
শৌনক রায়চৌধুরী
কলকাতা-৯

ত্রি	লো	চ	ন			বা	
			রা	ম	খি	লি	কা
কৌ			ন্ত				লী
শ		র	ক		হা	রি	ত
ল্যা	ং	চা		ম	হা		ন
সী				নো			য়
তা	র	কা	সু	র			
	ম্ভা			মা	দ্র	ব	তী

শব্দরূপের উত্তর পাঠান আমাদের ঠিকানায়। খামের ওপর লিখুন 'শব্দরূপ'।

▯ ৬২২ সংখ্যার সমাধান আগামী ১৪ মে, ২০১২ সংখ্যায়

শোকসংবাদ

পরলোকে নিত্যানন্দ দেবনাথ

রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের উত্তর ২৪ পরগণা বিভাগ কার্যবাহ নিত্যানন্দ দেবনাথ গত ২৮ মার্চ বেলঘরিয়ায় নিজ বাসভবনে পরলোকগমন করেছেন। বেশ কিছুদিন ধরে তিনি ক্যানসার রোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। সরল সাধাসিধে জীবন এবং স্বদেশ ও সমাজের কাজে তিনি নিরন্তর সচেষ্ট ছিলেন। চারবছর আগে পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎপর্ষদ থেকে অবসর গ্রহণ করেন। তিনি স্ত্রী, এক পুত্র, এক কন্যা ও বহু গুণমুগ্ধ বন্ধুদের রেখে গেছেন। বাল্যকাল থেকেই তিনি সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। সঙ্ঘের বিভিন্ন কাজের দায়িত্ব এবং শেষে বিভাগ কার্যবাহের দায়িত্ব তিনি পালন করেছেন। ২০১১ সালে সঙ্ঘ শিক্ষাবর্গে তিনি বর্গাধিকারীর দায়িত্বও পালন করেন। পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের এক সুষ্ঠু সমন্বয় তাঁর মধ্যে দেখা গিয়েছিল।

***

গত ৩ এপ্রিল বীরভূম জেলার সিউড়ী শহরের পাঁচ টাকার ডাক্তার শান্তি কুমার দে ইহলোক ত্যাগ করেছেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বৎসর। প্রভুপাদ শ্রীশ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর ভাবশিষ্য ডাক্তার দে বহু প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। সিউড়ী পৌরসভায় তিনি ১০ বৎসর কমিশনার ছিলেন। সঙ্ঘপ্রেমী এই মানুষটি স্বয়ংসেবকদের কাছে ছিলেন অত্যন্ত শ্রদ্ধার একজন মানুষ।

***

ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘের অনুমোদিত পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য-সরকারি কর্মচারী সঙ্ঘের প্রাক্তন সভাপতি শম্ভুনাথ দাস গত ৩১ মার্চ পরলোক গমন করেছেন। তিনি রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের হুগলী জেলার ভদ্রেশ্বর মণ্ডল কার্যবাহ ছিলেন। মৃত্যুকালে তিন ছেলে, দুই মেয়ে ও নাতি- নাতনীদের রেখে গেছেন।

***

গত ৩০ মার্চ উত্তর দিনাজপুর জেলার কালিয়াগঞ্জ প্রখণ্ড, বিশ্ব হিন্দু পরিষদের প্রাক্তন সভাপতি ভুবনেশ্বর প্রসাদ গুপ্তা পরলোক গমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৭৮ বছর। তাঁর বড় ছেলে রাজেশ গুপ্তা ও দুই ছেলে সঙ্ঘের স্বয়ংসেবক। পুত্ররা ছাড়াও স্ত্রী সহ তাঁর দুই কন্যা বর্তমান।

***

আর এস এসের মালদা জেলার সহ বৌদ্ধিক প্রমুখ বুদ্ধদেব দাসের পিতৃদেব বিশ্বনাথ দাস গত ২ এপ্রিল পরলোকগমন করেন। মৃত্যুকালে তাঁর স্ত্রী সহ ৩ পুত্র-পুত্রবধূ, ১ কন্যা-জামাতা বর্তমান।

R. C. Bhandari
Financial Consultants

36, Basement,
8, Camac Street, Kolkatta - 700 017
Phone : 2282 7928

।। চিত্রকথা।। শ্রীরামের পূর্বপুরুষ দিলীপ।। ১৯

(সৌজন্যে : পাঞ্চজন্য)

ALOEVERA
A WONDER PLANT

Use EXOTICA brand ALOEVERA JUICE

Consume 30 ml. daily in empty stomach

Controls Acidity, Gas, Indigestion, Constipation etc.

HACCP & Organic Certified WHEATGRASS POWDER

*** 100% Natural food supplement.**

*** Promotes health and healing.**

Helps combat : Anemia, Diabetes, Acidity, Ulcers, Piles, Colitis, Arthritis, Cancer, Asthma, Heart Diseases, Skin Diseases, Allergies, Stress & Tension etc..

It is not only a product, but a pathway to healthy lifestyle

Contact for Details :

AYUSH BUILDERS PVT. LTD.

25, Ganesh Ch. Avenue, Kolkata - 700 013,
Tel. 2236-1706 / 1707

Free Home Delivery for order Above Rs. 450/-
With in kmc Limit.

Swastika RNI No. 5257/57 Postal Registration No. Kol. RMS/048/2010-2012
23 April - 2012

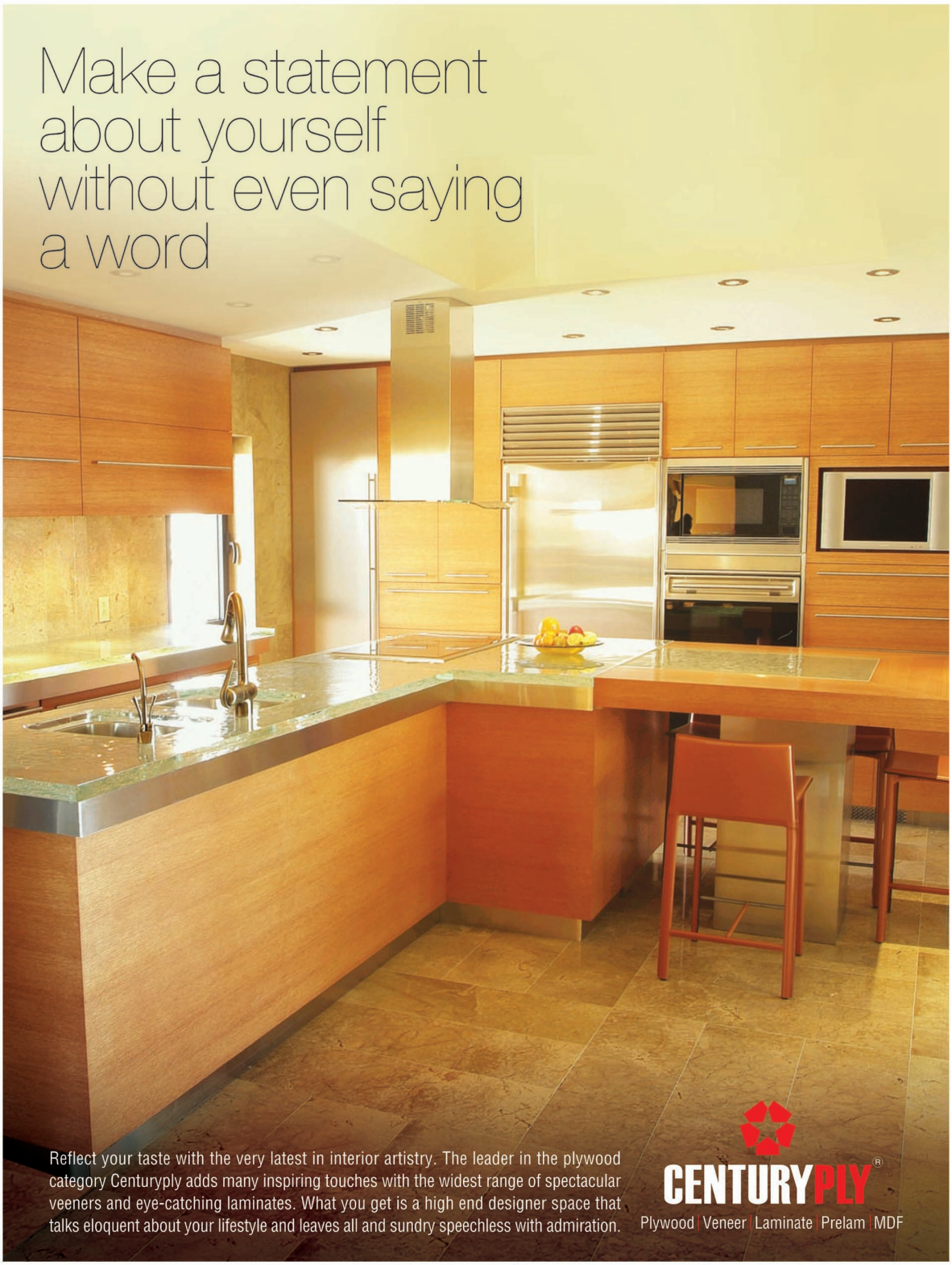

দাম : ৭.০০ টাকা